আর্গুমেন্টস অব আরজু

?

আরিফুল ইসলাম

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশনে'র পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

আর্গুমেন্টস অব আরজু

আরিফুল ইসলাম

আর্গুমেন্টস অব আরজু

সমকালীন প্রকাশন

আর্গুমেন্টস অব আরজু

আরিফুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০১৯

একমাত্র পরিবেশক

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 250 (Paperback), Tk. 300 (Hardcover), US $ 10.00 only.

ISBN : 978-984-93864-1-4

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।[১]

[১] সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত : ৮১

প্রকাশকের কথা

ইসলাম-বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। দীর্ঘকাল ধরে এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যাচার, অপবাদ এবং প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন-সাধনের সাথে সাথে ব্যাপারটি আরও সুবিধাজনক হয়ে উঠছে বিরুদ্ধবাদীদের। এখন তারা পূর্বের চেয়ে আরও বেশি তৎপর।

ইন্টারনেট দুনিয়াজুড়ে এখন ইসলাম, আল্লাহ, নবী-রাসূল, কুরআন, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে কৌশলী ধারায় চলছে নানা-রকম কুৎসা ও মিথ্যাচারপূর্ণ প্রচারণা। বিভিন্ন ব্লগ ও ফেইসবুক ব্যবহার করে তারা সরলমনা মুসলিমদের মনে প্রবেশ করাচ্ছে অমূলক সন্দেহ। তাদের এই অযাচিত মিথ্যাচার, প্রোপাগান্ডা ও বিদ্বেষপূর্ণ লেখা পড়ে সন্দিহান হয়ে পড়ছে আমাদের কোমলমতী তরুণ সমাজের এক বিশাল অংশ। তাদের মনে বিশ্বাসের বদলে জায়গা করে নিচ্ছে ভ্রান্তবিশ্বাস।

ধর্ম আর বিজ্ঞানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে যারা ভ্রান্তবিশ্বাসের ধুম্রজাল তৈরির পাঁয়তারা করে বেড়ায়, তাদের মোক্ষম জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছেন সময়ের কলম-সৈনিক আরিফুল ইসলাম। এই তরুণ, ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টদের মিথ্যাচার এবং অপবাদের বিরুদ্ধে একজন সাহসী কথাশিল্পী।

সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসের যৌক্তিক-বার্তা দিয়ে অবিশ্বাসের ধোঁয়াশা দূর করতে তার কলম সিদ্ধহস্ত। ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো শত অভিযোগের সুন্দর, যৌক্তিক ও সহজপাঠ্য উত্তরের মায়াজালে তিনি রচনা করেছেন *আর্গুমেন্টস* অব

আরজু। 'আরজু' চরিত্রটি কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তিনি সাজিয়েছেন গল্পের পসরা। বুনে গেছেন সত্য ও বিশ্বাসের দারুণ সব কথামালা; চুরমার করতে চেয়েছেন কুচক্রী মহলের সংশয়-বাণ। একজন বিশ্বাসী এবং প্রতিবাদী চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে 'আরজু' চরিত্রটিতে।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের জবাবগুলোকে গৎবাঁধা ধারায় না সাজিয়ে লেখক সেগুলোকে প্রাণবন্ত গল্পে রূপ দিয়েছেন। গল্পগুলোতে রেখেছেন চমৎকার কাহিনি-বিন্যাস। চারপাশের পরিবেশ এবং পরিস্থিতিকে সামনে রেখে গল্পের যে-বুনন তিনি করেছেন তা প্রসংশনীয়।

'আর্গুমেন্টস অব আরজু' নিছক ইসলামী কোনো বই নয়। এটি আঁধারের বিরুদ্ধে আলোর উদয়, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের ঢাল, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের তলোয়ার। বইটি বিশ্বাসী আত্মাসমূহ প্রশান্ত করবে আর মুছে দেবে সবরকম দ্বিধা ও সন্দেহগ্রস্ততা—এই আমাদের প্রত্যাশা।

বইটির লেখক আরিফুল ইসলামের দীর্ঘ-হায়াত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাকে এবং আমাদের সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর অটল-অবিচল রাখেন। আমীন।

সমকালীন পরিবারের প্রতিটি সদস্য তাদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছে বইটি নির্ভুলভাবে আপনাদের নিকট উপস্থাপন করতে। তারপরও বইটির কোথাও কোনো ভুল যদি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তা আমাদের জানানোর বিশেষ অনুরোধ করছি।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার—যার অগণিত নিয়ামতে আমরা ডুবে আছি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নিজের মুডকে 'গড' বানিয়ে ফেললে সেই সহজাত প্রবৃত্তিকে মানুষ মুখে অস্বীকার করা শুরু করে; কিন্তু বিপদে পড়লে ঠিকই স্বীকার করে নেয়, তার মুড তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। ফেরাউনের মতো কাফের, যে নিজেকে 'প্রভু' বলে দাবি করেছিল, লোহিত সাগরে ডুবে মারা যাবার মুহূর্তে সে বলেছিল, আমি ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

অন্ধের হাতি দেখার মতো যারা ইসলামকে দেখে, অজ্ঞতার কারণে ইসলামকে তাদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। নিজেদের যুক্তিবাদী প্রমাণের জন্য তারা যেসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে যুক্তির অবতারণা করে, সেগুলো অনেকাংশে থাকে মিথ্যায় পরিপূর্ণ। সেই মিথ্যায় ভর করে তারা চায় ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে!

হিটলারের মন্ত্রীর মতে, 'একটি মিথ্যা একশোবার বললে সেটি সত্য হয়ে যায়; কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তা হয় না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—হে ঈমানদারগণ,

---

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯০

যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখো।[১]

বেশিরভাগ সময়ে ইসলাম নিয়ে আরোপিত অভিযোগের মূলে থাকে মিথ্যাচার। সেই মিথ্যাচার যাচাই-বাছাই করে 'মিথ্যা' প্রমাণিত করার সাথে সাথে থলের বিড়ালদের লুকোচুরির ইতি ঘটে।

মিথ্যা এবং অজ্ঞতাকে পুঁজি করে যারা ইসলামের সমালোচনা করেন, *আর্গুমেন্টস অব আরজু* বইতে তাদের মিথ্যাচার এবং অজ্ঞতার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বালির বাঁধ যেমন টেকসই হয় না, মিথ্যার জয়জয়কারও তেমনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। মিথ্যার বাঁধে *আর্গুমেন্টস অব আরজু* একটি ঢিল।

আর্গুমেন্টস অব আরজুর সমকালীন সংস্করণ প্রকাশ করায় সমকালীন প্রকাশন-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমি ঋণী। আল্লাহ তাদের এই শ্রমকে কবুল করুন।

বইটিতে ভালো যা কিছু আছে—তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যা ত্রুটিবিচ্যুতি আছে—তা আমার। বইটি নিয়ে যে-কোনো গঠনমূলক সমালোচনা সর্বদাই স্বাগতম।

আরিফুল ইসলাম

ariful459203@gmail.com

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ৬

সূচিপত্র

মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া

টিএসসিতে একটা প্রোগ্রামে এটেন্ড করার কথা আমার আর আরজুর। হল-গেটের সামনে আরজুর জন্য অপেক্ষা করছি।

আরজু আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, হাতঘড়ি পরা শুরু করলি কবে থেকে?'

'আর বলিস না, মা'কে রোজ রাত ১০টায় ফোন করি। সে-দিন ব্যস্ত ছিলাম তাই ফোন করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। মা রাত ১০.৪৫-এ ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, ফোন করতে এতো দেরি কেন? আমি বললাম, একটি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই সময়মতো ফোন করতে ভুলে গেছি। গতকাল দেখি আমার নামে একটি পার্সেল এসেছে। খুলে দেখি এই নতুন ঘড়ি। মা পরে ফোন করে বললেন, এবার থেকে ঠিকমতো ফোন করো।'

আমি হেসে বললাম, 'বাহ! মায়ের আদরের ছেলে।' পরক্ষণে খেয়াল করে দেখলাম, আরজু তার ঘড়িটি পরেছে ডান হাতে, আমরা সাধারণত বাম হাতে ঘড়ি পরি। আরজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে ডান হাতে ঘড়ি পরছিস যে?'

'আরে এমনিতেই পরেছি, চল যাই।'

আরজু সাধারণত কোনো কাজ এমনি এমনি করে না, কাজ করার পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ থাকবে।

হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি করে বল, 'কেন ডান হাতে ঘড়ি পরেছিস?'

আমার নাছোড়বান্দা স্বভাব দেখে আরজু বলল, 'আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কাজ শুরু করার সময় ডান দিক থেকেই শুরু করতেন। কোনোকিছু পরার বেলায়ও ডান দিক থেকে। এই যেমন—জুতো, জামা; কিন্তু তখনকার সময় তো ঘড়ি ছিল না তাই ঘড়ি নিয়ে বলা হয়নি। ওই সুন্নাতটি ফলো করতে গিয়ে আমি ঘড়ি ডান হাতে পরেছি। তাছাড়া ডান হাতে ঘড়ি পরলে নামাজে হাত বাঁধতে সুবিধা হবে। ঘড়ির ওপর হাত বাঁধা লাগে না।'

আরজুর কথা শুনে বরাবরই মুগ্ধ হই, এই কথা শুনেও মুগ্ধ হলাম। তাই সাথে সাথে আমার বাম হাতের ঘড়িটি ডান হাতে পরলাম।

সামাজিক বিজ্ঞান চত্বরের সামনে দিয়ে যাবার সময় অভিজিৎ দা 'আরিফ' বলে ডাক দিলেন। আমি আর আরজু দাঁড়ালাম। অভিজিৎ দা হাত দিয়ে ইশারা দিচ্ছেন তার কাছে যাবার জন্য। আমি আরজুর দিকে তাকালাম আর আরজু ঘড়ির দিকে। অভিজিৎ দা আবার ডাক দিলেন, আরে, কী এতো ভাবছ? এদিকে আসো।

অভিজিৎ দা'র কাছে যাবার পর তিনি বললেন, 'দুই হুজুর কই যাচ্ছ? দাদাকে তো একদম ভুলেই গেছ!'

আমি বললাম, 'আরে না, দাদা, আপনাকে কি ভুলে যেতে পারি।'

অভিজিৎ দা'র সাথে আরেকজন লোক বসা ছিলেন। অভিজিৎ দা তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম, ৬টার সময় টিএসসিতে একটা প্রোগ্রাম আছে আমাদের। অভিজিৎ দা বললেন, 'এখন বাজে মাত্র ৫.৩৫, ৬টা বাজতে আরও ২৫ মিনিট বাকি। তার ওপর এসব অনুষ্ঠান শুরু হতে আরও আধঘণ্টা বেশি লাগবে।'

কোথাও যেতে হলে আরজু ১৫-২০ মিনিট হাতে রেখে বের হয়, তাই সময় যখন হাতে আছে আমরা বসলাম অভিজিৎ দা'র কাছে।

'চা খাব কি না' জিজ্ঞেস করলে আমি হেসে বললাম, 'চা-তে 'না' নাই।' অভিজিৎ দা চায়ের অর্ডার দিলেন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর অভিজিৎ দা বললেন, 'আচ্ছা শুনলাম, তোমাদের কুরআনে নাকি সামান্য পিঁপড়ার কাহিনিরও উল্লেখ আছে, ওরা

একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে—সেই কাহিনিও আছে।'

আসার আগে মনে মনে ভাবছিলাম; এরকম কিছু নিয়েই হয়তো কথা বলার জন্য ডাকছেন। আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, এরকম কাহিনি আছে। এমনকি শুধু পিঁপড়ার নামে পবিত্র কুরআনে একটি সূরাও আছে। সূরাটির নাম 'নামল' মানে, পিঁপড়া।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই অভিজিৎ দা হেসে গড়িয়ে পড়বেন এই অবস্থা। সাথে থাকা লোকটিও হেসে একজন আরেকজনকে হাই-ফাইভ দিচ্ছে।

হাসি থামার পর অভিজিৎ দা বললেন, 'বড়ই হাস্যকর তোমাদের কুরআন। পশু-পাখির নামে একেকটি অধ্যায়, কোথাও গোরুর নামে সূরা, কোথাও মৌমাছির নামে আবার কোথাও পিঁপড়ার নামে! এটা তো আদিম যুগের মানুষের কিচ্ছা-কাহিনিতে ভরপুর, কৃষক আর পশু-শিকারী মানুষদের দিনলিপি।'

এটা বলার পর এবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তেন অভিজিৎ দা যদি না পাশের লোকটি তাকে ধরতেন। হাসি থামানোর পর প্রথমবারের মতো আরজু মুখ খুলল। অভিজিৎ দা'কে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা অভিজিৎ দা, বলো তো, বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন কোনটি?'

অভিজিৎ দা আবারও হাসলেন। হাসি থামার পর বললেন, 'এটা কোনো প্রশ্ন হলো? এখন বিসিএসের পড়া পড়ছি, প্রশ্নটা তো দুধভাত। বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিনের নাম পিপীলিকা, সাস্টের শিক্ষার্থীরা বানিয়েছে।'

আরজু অভিজিৎ দা'র কথায় সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আর এই পুরোটার তত্ত্বাবধান করেছেন ড. জাফর ইকবাল স্যার।'

অভিজিৎ দা বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি।'

এবার আরজু বলল, 'এই আধুনিক যুগে এসে কেউ আধুনিক প্রযুক্তির নামকরণ করছে 'পিপীলিকা' আর তাদের আপনি বিজ্ঞানমনা বলছেন; কিন্তু ১৪০০ বছর আগে কেউ পিপীলিকার কথা বললে আপনি তা আদিম যুগের বর্বর মানুষের সাথে তুলনা করছেন। বাহ! এটাই হলো আপনাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড!'

আরজুর কথা শুনে অভিজিৎ দা'র মুখ থেকে হাসির রেখা অনেকখানি মুছে গেল। কিছু একটা তো এখন বলতে হবে। তাই অভিজিৎ দা বললেন, 'নিশ্চয়ই পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিনের নামকরণের পেছনে কোনো কারণ আছে।'

'Come to the point. নিশ্চয়ই এটার পেছনে কারণ আছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, মানুষের মতো পিঁপড়ারও একটা সমাজ আছে। মানুষ যেমন দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, চাষাবাদ করে, একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি বানায়, পরবর্তী সময়ে খাওয়ার জন্য খাদ্য মজুদ রাখে—পিঁপড়াও তেমন মানুষের মতো জীবন-যাপন করে। এমনকি মানুষ মারা গেলে যেমন তাকে দাফন করা হয় তেমনই কোনো পিঁপড়া মারা গেলে বাকি পিঁপড়ারা তাকে বহন করে নিয়ে দাফন করে। এইদিক দিয়ে পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্য মানুষের বৈশিষ্ট্যের সাথে বেশ মিল আছে।'

আরজুর কথা শেষ হলে অভিজিৎ দা স্মিত হাসি হেসে বললেন, 'আমি জানতাম, পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিনের নামের পেছনে হয়তো এরকম কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে।'

আরজু পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তাহলে পবিত্র কুরআনে এরকম বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তখন কেন প্রতিহিংসাস্বরূপ এটা নিয়ে বিদ্রূপ করছেন?'

আরজুর কথা শুনে আগের মতো আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন অভিজিৎ দা। বিদ্রূপ করে বললেন, 'কুরআনে আবার বৈজ্ঞানিক তথ্য, যেখানে বলা হয়েছে পিঁপড়া তাদের মধ্যে কথা বলছে সেটা তো রূপকথার গল্প হবে, বৈজ্ঞানিক তথ্য না।'

আরজু আমাকে বলল, 'তোর মোবাইল থেকে কুরআনের এ্যাপসটি বের করে সূরা নামলের ১৮ নাম্বার আয়াতটি পড়ে শোনা তো।'

আমি মোবাইল বের করে প্রথমে সূরা নামলের ১৮ নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করলাম এবং বাংলা অনুবাদ পড়লাম—

হে পিঁপড়ারা, তোমরা তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে অথচ তারা টেরও পাবে না।

আরজু অভিজিৎ দা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়াতে থাকা আরবী শব্দ 'কালাত নামলাহ'—মানে হলো, 'একটি নারী পিঁপড়া বলল'। আর এখানে 'হে পিঁপড়ারা' বলে যাদের সম্বোধন করেছে তারাও নারী পিঁপড়া। অর্থাৎ ঘরের বাইরে থাকা এক নারী পিঁপড়া নারী পিঁপড়ার দলকে বলছে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে। কারণ, নারী পিঁপড়ারা থাকে ঘরের বাইরে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মাত্র সেদিন আমরা জেনেছি যে, নারী পিঁপড়ারা হলো কর্মী এবং পুরুষ পিঁপড়ারা হলো প্রজননের জন্য। ১৪০০ বছর আগে যখন আজকের মতো উন্নত টেকনোলজি ছিল না তখন কুরআন কীভাবে এরকম একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য দিল।'

অভিজিৎ দা হয়তো বলতেন এটি হয়তো কাকতালীয়ভাবে হয়ে গেছে আর কী; কিন্তু অভিজিৎ দা'কে সেটি বলার সুযোগ না দিয়ে আরজু বলে চলল, 'এমনকি কুরআনে পিঁপড়াদের মধ্যকার কথা বলার বিষয়ে বলা হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও মানুষ মনে করত পিঁপড়া কথা বলতে পারে না; কিন্তু কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, পিঁপড়া ফেরোমোন (Pheromone) নামক রাসায়নিক পদার্থের প্রতি সংবেদনশীল এবং এর দ্বারা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেরেমি থমাস (Jeremy Thomas) এবং স্প্যানিশ বিজ্ঞানীরা মিলে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেন পিঁপড়ার কথা বলার ওপর। ৪০০ লাল পিঁপড়ার ঘরের মধ্যে 4 mm এর মাইক্রোফোন এবং স্পীকার বসিয়ে দিয়ে আসলেন তারা। দেখা গেল, পিঁপড়াগুলো বেশ কয়েক ধরনের শব্দ করল। সেই শব্দ রেকর্ড করা হলো।

সেই রেকর্ড অন্য কর্মীপিঁপড়াদের কাছে নিয়ে অন করা হলে দেখা গেল, কর্মী পিঁপড়াগুলো সেই আওয়াজ শুনে ছুটোছুটি শুরু করে। তারা বিভিন্ন রকম এক্সপ্রেশান দেখাতে আরম্ভ করে।

পিঁপড়া যে কথা বলতে পারে সেটি নিয়ে ABC News-এ একটি ডকুমেন্টারিও করা হয়েছে।[১] অথচ সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর আগে উল্লেখ করেছে—যাকে আপনি 'রূপকথার গল্প' বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন।'

---

[১] Quran Miracle, Talking ants, scientific discovery on ABC news. (https://www.youtube.com/watch?v=UEGPOaAilvc)

অভিজিং দা আর কোনো কথা বলছেন না, আগের মতো আর হাসছেনও না। হঠাৎ 'উহ' বলে শব্দ করে উঠলেন। চেয়ে দেখলাম একটি কালো পিঁপড়া অভিজিং দা'কে কামড় দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছু হয়নি এরকম একটা ভাব নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন, আমরাও হাসছি।

হাঁটতে হাঁটতে আরজু আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মিথ্যাবাদীদের শাস্তি তুই কী দিবি?'

'ভেবে দেখিনি, তুই বল তো।'

'ছোটবেলায় যখন আমরা ইংরেজি Lieutenant বানানটি শিখেছি তখন তো আমরা এভাবে শিখছি, 'মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া'। আর এই শব্দগুলোর ইংরেজি করলেই Lieutenant হয়ে যায়। এজন্য বলা হয়, কেউ মিথ্যা কথা বললে তার দশটি পিঁপড়ার কামড় খাওয়া উচিত।'

মাগরিবের নামাজ পড়ে টিএসসির অডিটোরিয়ামে ঢুকলাম ৬.৩০ মিনিটে। আমরা ঢোকার সাথে সাথে প্রোগ্রাম শুরু হলো।

আল্লাহ অদ্বিতীয় হলে কুরআনে 'আমরা' শব্দ কেন?

বাসায় আসার সময় যে-বইগুলো এনেছিলাম সবগুলো পড়া শেষ। ভার্সিটি খুলবে আরও তিন দিন পর। সময় কাটানোর জন্য পুরনো ডায়েরিগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলাম।

ডায়েরি উল্টাতে গিয়ে চোখ পড়ল ফার্স্ট ইয়ারে টিএসসির এক স্মৃতির কথা। শিরোনাম দিয়েছিলাম 'টিএসসির আড্ডা'। টিএসসির শেষ-বিকেলের সেই আড্ডার স্মৃতি এখনও মানসপটে ভেসে ওঠে। ডায়েরিটি পড়া শুরু করলাম—

ভার্সিটিতে ভর্তির আগে যেসব জায়গার নাম জানতাম তার মধ্যে 'টিএসসি' নামটি এতোবার শুনেছি যে, মনে হতো ঢাবির আরেক নাম টিএসসি। ভর্তি হবার পর প্রথম প্রথম ক্লাস শেষ হলেই টিএসসিতে চলে যেতাম। একা গেলেও দেখতাম সেখানে পরিচিত কেউ-না-কেউ আছে। আড্ডা দেবার সঙ্গী পেয়ে যেতাম।

আজকে রেজওয়ান স্যারের ক্লাস একটু আগে শেষ হলো। এফবিএসের মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে আমি আর আরজু টিএসসি এলাম। টিএসসির সবুজ ঘাসের ওপর বসে আছি দুজন। দশ টাকার বাদাম কিনে চিবাচ্ছি আর আরজুকে মার্কেটিং-এর '4P' কনসেপ্টটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সকালের মার্কেটিং ক্লাসটি সে করতে পারেনি।

টিএসসির অডিটোরিয়ামে মনে হয় কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। হিন্দি গানের শব্দ অডিটোরিয়ামের বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। 'হামকো হামিসে চুরালো, দিল মে কাহি তুম চুপালো...'

একটু পর এলো বাংলা ডিপার্টমেন্টের জয়, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রুমেল আর ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের সোহান।

বাংলা ডিপার্টমেন্টে পড়ার দরুন হয়তো জয়ের মধ্যে একটা সাহিত্যিক সাহিত্যিক ভাব চলে আসছে। পাটের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সবসময় হাঁটে। ব্যাগের মধ্যে থাকে দু-চারটি কবিতার বই। রুমেলের গেটাপ দেখে ব্রিটিশ-ব্রিটিশ মনে হচ্ছে। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়ার দরুন হয়তো এই রঙবদল।

ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের সোহান গম্ভীর মুখে বসে আছে। কিছু বলতে চাচ্ছে—এরকম একটা ভাব। হাতে একটা কাগজ নিয়ে বসে আছে।

জয় জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, তোর হাতে এটা কীসের কাগজ?'

একটু সায় পেয়ে সোহান বলল, 'না মানে, কয়েকদিন ধরে আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে।'

'আমাদের সাথে শেয়ার কর; দেখি, পারলে সল্যুশন দিলাম, না-হয় দেখা যাবে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।'

'কয়েকদিন আগে কুরআনের একটি আয়াত পড়েছি। সেখানে আল্লাহ নিজেকে বোঝাতে 'আমরা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। আমরা তো জানি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাহলে তিনি 'আমি' শব্দ ব্যবহার না করে 'আমরা' শব্দটির ব্যবহার করলেন কেন? আর 'আমরা' তো বহুবচন শব্দ।'

সোহানের প্রশ্নটি আমার কাছেও যৌক্তিক মনে হলো; আসলেই তো, আল্লাহ 'আমি' না ব্যবহার করে 'আমরা' ব্যবহার করলেন কেন? আমরা সবাই একে অন্যের দিকে তাকালাম। একসময় যখন দেখলাম কেউই এর উত্তর জানে না, তখন সবাই একসাথে আরজুর দিকে তাকালাম। আরজু হেসে বলল, 'এটার উত্তরও আমাকে দিতে হবে?'

রুমেল বলল, 'এতো ভাব নিস না, পারলে উত্তর দে।' আরজু একটু নড়েচড়ে বসল। আমরাও উন্মুখ হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছি আরজুর আর্গুমেন্টস শোনার জন্য।

আরজু বলা শুরু করল, 'পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ নিজেকে বোঝাতে 'আমরা' সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন। যেমন—সূরা হিজরের ১০ নাম্বার

আয়াতে আল্লাহ বলেন—

আমরা আপনার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।

এছাড়াও সূরা হা-মীম সিজদার ৩৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

আমরা ভূমির ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি।

'আমরা' শব্দটি আরও পাওয়া যায় সূরা আলে-ইমরানের ১৪৫ নাম্বার আয়াতে, সূরা হিজরের ৯ নাম্বার আয়াতে, সূরা হিজরের ৮৫ নাম্বার আয়াতে।'

আমি এবার বললাম, 'তার মানে এটা সত্য যে, আল্লাহ কুরআনে নিজেকে বোঝাতে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন?'

আরজু মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটা সত্য।'

রুমেলের দিকে তাকিয়ে আরজু বলল, 'তুই তো ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের। Royal We সম্পর্কে জানিস না?'

'হ্যাঁ, জানব না কেন? 'Royal We is the use of 'We' instead of 'I' by an individual person as traditionally used by sovereign.'

'বাহ! তুই তো দেখি অক্সফোর্ড ডিকশনারির ডেফিনেশনটা হুবহু মুখস্থ করে ফেলেছিস।'

রুমেলর মুখস্থ ডেফিনেশন বলা আর আরজুর পচানি শুনে আমরা হাসলেও বুঝতে পারলাম না Royal We মানে কী!

আরজু বিষয়টা আরও সহজ করার জন্য বলল, 'ইংরেজিতে Royal We হলো ঐশ্বর্যশালী বহুবচন; যা দ্বারা একজনকেই বোঝায়। যেমন, কোনো রাজা যখন একটি রাজ্য জয় করতেন তখন বলতেন 'We have conquered the land' এখানে ব্যবহৃত We হলো Royal We। এখানে রাজা We ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। ১৯৮৯ সালে মার্গারেট থ্যাচার যখন দাদি হন তখন তিনি এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলেন, We have become grandmother. এই সব জায়গায়

We এর ব্যবহার হলো Royal We হিসেবে।'

সোহান এবার বলল, 'Royal We' কি তাহলে রাজা-রাণীরাই ব্যবহার করেন?'

'না, আমরাও ব্যবহার করি। আচ্ছা বল তো Subject first অথবা second person singular number হলে verb singular হয়, নাকি plural?'

আমরা সবাই সমস্বরে বললাম, 'verb singular হবে।'

আরজু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'You' second person singular number। তাহলে 'You' এর সাথে verb কী হবে?'

আমি বললাম, 'is অথবা was হবে।'

আরজু বলল, 'তাহলে আমরা You is/was my friend বলি, নাকি You are/were my friend বলি।'

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। আরজু বলে চলল, 'এখানে are টা হলো Royal plural; যা একজনকেই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।'

এতোক্ষণে আমরা Royal We বুঝলাম; কিন্তু এটা বুঝে আসছে না—আল্লাহ কেন Royal We ব্যবহার করলেন। আমাদের মুখভঙ্গি দেখে হয়তো আরজু বুঝল আমরা এটাই জানতে চাচ্ছি, তাই সে বলা শুরু করল, 'কুরআনের যত জায়গায় আল্লাহ 'আমরা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন তার বেশিরভাগ জায়গায় আল্লাহ নিজের ক্ষমতা প্রকাশে কিংবা আল্লাহর দয়া বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। আর আরবী ভাষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। এ ভাষা বুঝতে হলে কেবল এ ভাষার অর্থ আক্ষরিকভাবে বুঝলেই হবে না।'

টিএসসির অডিটরিয়ামে আবার আরেকটা গান শুরু হয়েছে। 'হাম তুমকো নিগাহো ম্যা, ইস ত্যারা চুপা ল্যাঙ্গো...তুম চাহে ব্যাচো জিতনা, হাম তুমকো চুরা ল্যাঙ্গো...।' মনে হচ্ছে যেন আজকের সবগুলো গান 'হাম' দিয়ে।

তখন আরজু বলল, 'এই যে হিন্দিতে 'হাম' দিয়ে যে গান গাওয়া হচ্ছে, এই 'হাম' অর্থ আমরা; কিন্তু গানে 'হাম' মানে আমরা না বুঝিয়ে 'আমি' বোঝানো হচ্ছে। হাম হলো হিন্দি ভাষার Royal We।'

এরইমধ্যে মাগরিবের আযানের সুর ভেসে এলো, আমরা চললাম সেন্ট্রাল মসজিদের দিকে। হামওয়ালা গানগুলোও তখন বন্ধ হয়ে গেল।

ডায়েরিটা পড়া বন্ধ করলাম। তখন মনে পড়ল আবিরের কথা। কয়েকদিন আগে আবির আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিল। তখন ব্যস্ত থাকার কারণে উত্তর দিতে পারিনি। তাছাড়া অনেকদিন ধরে আবিরের সাথে দেখা হয় না। ফোন হাতে নিলাম আবিরকে বাসায় আসার দাওয়াত দেবার জন্য।

আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো কে পুড়িয়েছেন?

ভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে 'বিসিএস লাইব্রেরি' করলেই হয়। ভোরবেলা থেকে শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে থাকে লাইব্রেরিতে বসার একটা সিট পাবার জন্য। বসে কী পড়বে? ব্যাগে নিয়ে আসা বিসিএসের বই!

শুনেছিলাম এই লাইব্রেরিতে নাকি প্রায় ছয় লক্ষ বই আছে। তবে দুঃখজনক হলো, কোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে গেলে দেখা যায় বইয়ের গায়ে ধুলোর স্তুপ জমে আছে। বই পড়তে গেলে আগে বইয়ের গায়ের ধুলোবালি মুছতে হয়।

ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিসিএসের চিন্তা এমনভাবে পেয়ে বসে যে, লাইব্রেরির অন্যান্য বইগুলো খুলে দেখার সময়ও তারা পায় না। অবশ্য এরমধ্যে ব্যতিক্রমও কেউ কেউ আছে। আরজু তাদের একজন।

আজ আরজু লাইব্রেরিতে আসেনি, আমি একা এসেছি। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে আমরা একটি কাজ শুরু করেছি। আমরা বলতে—আমি, জামান আর আরজু। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট লেখকদের বই থেকে শুধু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশটুকু আলাদা করার কাজ আমার। জামানের কাজ ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো থেকে শুধু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশগুলো আলাদা করা। আর আরজুর কাজ হলো উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে করা অমুসলিম, ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভিন্ন অভিযোগ এবং তার জবাব দেওয়া।

লাইব্রেরিতে আমার কাজ শেষ করে মোবাইল বের করলাম। আরজু বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় মোবাইল সাইলেন্ট করেছিলাম; তাই বুঝতে পারিনি।

আরজুকে ফোন করলাম। সে কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে বসে আছে। দুপুরে আমাদের একসাথে খেতে যাবার কথা। অনেকদিন ধরে পুরান ঢাকার বিরিয়ানি খাই না।

ব্যাগ গুছিয়ে আরজুর কাছে গেলাম। আরজু আলী সাল্লাবীর লেখা 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী' বইটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আরজুর পাশে বসলাম। কবরের দিকে তাকিয়ে আরজু বলল, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের 'উমর ফারুক' কবিতা পুরোটা পড়ছিস?

'মাধ্যমিকের বাংলা বইয়ে যেটা ছিল?'

'হ্যাঁ, অবশ্য বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া। পুরো কবিতাটি আরও বড়।'

'না, পুরোটা পড়িনি।'

আরজু মোবাইল বের করে 'কবিতাগুচ্ছ' এ্যাপটা ওপেন করল। এটাতে আরজু তার পছন্দের কবিতাগুলো নোট করে রাখে।

যোহরের নামাজের বেশ বাকি আছে। আরজু কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। কী দরদমাখা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলাম উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনচিত্র কবিতায় তুলে ধরছেন—

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

কবিতা আবৃত্তির এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত হলেন রিয়ান ভাই, সাথে তার স্কোয়াড। আদর্শিক দিক থেকে আরজু আর রিয়ান ভাই উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু হলেও তাদের মধ্যে বেশ সখ্য। আরজু যেমন তার আদর্শিক দাওয়াতের বই রিয়ান ভাইকে উপহার দেয়, রিয়ান ভাইও তাদের আদর্শিক বইগুলো আরজুকে উপহার দেন।

'শাহবাগ যাচ্ছিলাম। দেখলাম তুমি এখানে বসে আছ, তাই ভাবলাম ছোট ভাইটার সাথে দেখা করে যাই।'

'যাক, ছোট ভাইয়ের কথা তাহলে মনে আছে।'

রিয়ান ভাই নানা ব্যস্ততার কথা বললেন, যার দরুন আমাদের সাথে দেখা করতে পারছেন না ইদানীং। তার সাথে থাকা সবাইকে পরিচিয় করিয়ে দিলেন।

আরজুর চোখ গেল একজনের হাতে থাকা একটি বইয়ের দিকে। ছেলেটির নাম রণক, Sociology-তে পড়ে। রণক বইটি উঁচিয়ে দেখাল, মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা *আরো একটুখানি বিজ্ঞান*।

রণক বলল, 'রিয়ান ভাই বইটা গিফট করেছেন।'

'না বললেও বুঝতাম, এই বইটা রিয়ান ভাই-ই গিফট করে থাকবেন। কয়েকদিন আগে আমাকেও তিনি বইটা গিফট দিয়েছিলেন। বইটা এখনও পড়া হয়নি।'

আমরা এখন কী কাজ করছি জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে কাজ করছি।'

রিয়ান ভাই বললেন, 'Oh! The man who burnt the books in Alexandria Library?'

আরজু বলল, 'রিয়ান ভাই, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম শোনার পর তো একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফার কথা বলতে পারতেন, বলতে পারতেন একজন প্রজাদরদী খলীফার কথা; কিন্তু তা না বলে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি পোড়ানোর কথা কেন বলছেন?'

'আসলে আরজু, এটা মানবপ্রকৃতি। যেমন ধরো, একটা হোয়াইট বোর্ডে যদি কালো মার্কারের একটা দাগ থাকে তাহলে পুরো হোয়াইট বোর্ডে সাদা অংশটুকুতে চোখ না পড়ে শুধু চোখ আটকাবে কালো অংশটুকুতে। ঠিক তেমনই, উমার অনেক কিছু করছেন ঠিক; কিন্তু তার জীবনের ওই একটা কাজ পুরো হোয়াইট বোর্ডের কালো দাগের মতো ভেসে ওঠে।'

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের হোয়াইট বোর্ডে কালো দাগটা কী সেটা রিয়ান ভাই এক্সপ্লেইন করলেন। তিনি যা বললেন, তা মোটামুটি এরকম :

খলীফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় যখন মিসর বিজিত হয় তখন মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। আলেকজান্দ্রিয়ার

লাইব্রেরির বইগুলো কী করবেন, সে-সম্পর্কে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন—

'বইপত্রগুলো যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ না হয়, তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই এগুলোর ধ্বংস অনিবার্য। আর বইপত্রগুলোতে যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ কথা থেকেও থাকে, তবে সেগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই বইগুলো ধ্বংস করো।'

খলিফার নির্দেশে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলেন। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম লাইব্রেরিটি এভাবেই ধ্বংস করা হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারের নির্মম বলি হয় দ্যা গ্রান্ড লাইব্রেরি।

ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে গতরাতে আরজুর সাথে আলোচনা হয়েছে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী লেখার কাজটুকু করতে গিয়ে আরজুর পার্টে এটা পড়েছিল। এই বিষয়ে আমার পার্ট থেকে কিছু ইনফরমেশন আরজুকে দিয়েছিলাম। যেহেতু আমার কাজ ছিল অমুসলিম লেখকদের বই থেকে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশটুকু আলাদা করা।

গতরাতের তথ্যগুলো থেকে আরজু বলা শুরু করল—

'রিয়ান ভাই, মুসলিমরা মিসর জয় করে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে আর আপনি যে ঘটনাটি বললেন, সেটি লিপিবদ্ধ করা হয় মিসর জয়ের প্রায় ৬০০ বছর পরে।'

রিয়ান ভাই এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন।

'প্রথমে আব্দুল লতিফ (১২০৩) তারপর ইবন আল কিফতি (১২২৭) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এই দুজনের উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রিস্টান লেখক বারহেব্রাইয়াস (Barhebraeus) ঘটনাটি উল্লেখ করেন। ১৬৬৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রফেসর Edward Pococke এই ঘটনাটি উল্লেখ করে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন।'

এই বলে আরজু তার হাতে থাকা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে লেখা ড. মুহাম্মদ আলী আস-সাল্লাবীর বইটি খুলল।

'এই দেখুন রিয়ান ভাই, ড. মুহাম্মাদ আলী আস-সাল্লাবি তার *Umar Ibn Al-Khattab- His Life and Times* গ্রন্থে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া নির্দেশের ঘটনাটিকে একটি 'বানোয়াট গল্প' বলে উল্লেখ করেছেন।'[১]

আরজুর কথা শুনে রিয়ান ভাই বিকৃত এক হাসি দিলেন। তার সাথের একজনকে বললেন, ব্যাগ থেকে বই বের করতে। সে ব্যাগ থেকে বই বের করলে রিয়ান ভাই বললেন, এই দেখো, এম.এন রায় তার *The Historical Role of Islam* বইতেও এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডিফেন্ড করতে এই ঘটনাকে 'বানোয়াট' বলতেই পারে; কিন্তু এম.এন. রায় ঠিকই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এবার বলো, কার কথাকে সঠিক মানব?

আমার ব্যাগ খুঁজতে লাগলাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ঘটনাকে অমুসলিম ইতিহাসবিদরা কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন এটার এক কপি আরজুকে দিয়েছিলাম, আরেক কপি আমার ব্যাগে থাকার কথা। আলহামদু লিল্লাহ, খুঁজে পেলাম। আরজুর কাছে কপিটা দিয়ে বললাম, এই নে।

আরজুর কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে কপিটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলা শুরু করল—

'আপনি এই ঘটনার জন্য যেহেতু মুসলিম সোর্সগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, এজন্য আমি অমুসলিম সোর্সগুলো থেকেও ঘটনাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করব, ইন শা আল্লাহ। ইসলামের ইতিহাস জানতে আপনারা যে-ব্যক্তিটির ওপর ভরসা করেন, সেই পি.কে. হিট্টি এই ঘটনাটিকে কী বলেছেন—এবার দেখে নেওয়া যাক। আরজু হাতে থাকা কপি থেকে পড়া শুরু করল।

পি. কে. হিট্টির ভাষায়—

> At the time of the Arab conquer (Egypt), therefore no library existed in Alexandria.

---

[১] *Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times by Dr. Muhammad Ali al-Sallabi*, vol-2, page 339–341

অর্থাৎ, আরবরা যখন মিসর জয় করে তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় কোনো লাইব্রেরিই ছিল না।

মুসলিমরা মিসর জয়ের আগে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি অন্তত ৪ বার বিভিন্ন যুদ্ধের সময় পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রথমবার ৮৯-৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, দ্বিতীয়বার জুলিয়াস সিজার কর্তৃক ৪৮ খ্রিস্টাব্দে, তৃতীয়বার ২৭৩ খ্রিস্টাব্দে, চতুর্থবার ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশের ইতিহাসকে পি.কে হিট্টি বলেন—

> Tales that make good fiction but bad history.

অর্থাৎ, এই গল্পটা 'বানানো গল্প' হিসেবে খুব ভালো; কিন্তু ইতিহাসের বেলায় খুব দুর্বল।[১]

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্থার স্ট্যানলি ট্রিটন তার *What Happened To The Ancient Library Of Alexandria* গ্রন্থে লেখেন—

> It has been proved that Umar I did not destroy the library at Alexandria.

আরেকটু অগ্রসর হয়ে তিনি লেখেন—

> The myth of the arab destruction of the library of alexandria is not supported by even a fabricated document.

অর্থাৎ, আরবদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের কাহিনি একটি জাল দলিলপত্র দিয়েও সমর্থিত নয়।[২]

এতোটুকু শুনেই রিয়ান ভাই আর তার স্কোয়াডের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, এর পরের তথ্যবোমা শুনে না জানি কী অবস্থা হয়।

---

[১] History Of The Arabs From The Earliest Times To The Present by Philip K. Hitti, page 166

[২] What Happened To The Ancient Library Of Alexandria by Bernard Lewis, page 213 – 217

আরজু বলে চলল, 'আপনারা যাকে দার্শনিক পিতা বলেন, হুমায়ূন আজাদ তার *আমার অবিশ্বাস* বইটি যাকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই ব্রিটিশ দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল তার *Human Society in Ethics and Politics* গ্রন্থে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেবার কাহিনিটিকে মুসলিমদের অসহিষ্ণুতা প্রমাণের জন্য 'খ্রিষ্টানদের প্রোপাগাণ্ডা' এবং 'সম্পূর্ণ বানোয়াট' বলে অভিহিত করেছেন।'[১]

কিছু মানুষ তাদের পছন্দের মানুষদের কথা শুনলে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। তাদের এসব পছন্দের মানুষরা যা-ই বলেন না কেন, কথায় কথায় তারা বলে 'সহমত ভাই'।

রিয়ান ভাইদের কাছে বার্ট্রান্ড রাসেল এমন একজন ফিগার। বার্টান্ড রাসেল যেহেতু ঘটনাকে বানোয়াট বলেছেন, রিয়ান ভাইদেরও তখন আর মেনে নিতে আপত্তি নেই, ঘটনাটি যে বানোয়াট।

রিয়ান ভাই তখন হয়তো মনে মনে বলছেন, 'ছেড়ে দে ভাই, কেঁদে বাঁচি'; কিন্তু আরজু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, বলেই চলল,

'আরেক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আলফ্রেড জে. বাটলার উমার রাযিয়াল্লাহুর লাইব্রেরি পোড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার ইতিহাসকে একটি হাস্যকর কাহিনি বলে উল্লেখ করে বলেছেন—

> The story is a mere fable, totally destitute of historical foundation.[২]

ভারতের পণ্ডিত ডি.পি. সিংগহাল তার *India and World Civilization* গ্রন্থে কাহিনিটিকে একটি 'বানোয়াট' কাহিনি বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

[১] Human Society In Ethics And Politics by Bertrand Russell, page 217 – 218

[২] The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman Dominion by Alfred J. Butler, page 405 – 408

[৩] India And World Civilization by D. P. Singhal, volume 1, page 136 – 137

এডওয়ার্ড গিবন এই কাহিনিকে জোরালোভাবে অস্বীকার করে বলেন—

> I am strongly tempted to deny both the fact and the consequences.' [১]

এই বলে আরজু উঠে দাঁড়াল। রণকের হাত থেকে *আরো একটুখানি বিজ্ঞান* বইটি নিয়ে রিয়ান ভাইকে দিয়ে বলল, 'অন্তত এই বইটার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা উল্টালেই আপনার অভিযোগের জবাব পেয়ে যাবেন।'

এই বলে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। পেছনে চেয়ে দেখলাম রণক ভাই *আরো একটুখানি বিজ্ঞান* বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে।

মনে মনে বললাম, এখনও কি তাদের সত্য গ্রহণের সময় আসেনি?

---

[১] The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire by Edward Gibbon, volume V (3), page 439

ভবিষ্যদ্বাণী!

২০১২ সালের ডিসেম্বরে একটা মজার ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর অনেক মানুষ ভেবেছিল, এবার বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন কার কীরকম অভিজ্ঞতা ছিল—আজকের আলোচনার মূল বিষয় এটা।

আমাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে তাহমিদ সবচেয়ে বেশি মুভি দেখে। কোনো মুভি থেকে একটা ডায়লগ বললে সে বলে দিতে পারত এটা কোন মুভির ডায়লগ।

তাহমিদ তার অভিজ্ঞতার কথা বলা শুরু করল—'2012' মুভিটি দেখার পর থেকেই কিছুটা ভয়ে থাকি, আসলেই কি পৃথিবী ধ্বংস হতে যাচ্ছে? পরে দেখলাম, শুধু আমি না, যারা যারা মুভিটি দেখেছে তাদের অনেকেই, এমনকি যারা মুভিটি দেখেওনি টিভি চ্যানেলে বা পত্র-পত্রিকায় পড়েছে, তারাও শঙ্কায় পড়ে আছে।

তানভীর জিজ্ঞেস করল, 'কীসের শঙ্কা?'

তাহমিদ খানিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'আগে বলতে দিবি তো?'

পরক্ষণে মুচকি হাসি উপহার দিয়ে আবার বলা শুরু করল, '২০১২ সালের ২১ শে ডিসেম্বর পৃথিবী ধ্বংস হবে এরকম একটি ধারণা পাওয়া যায় মায়া সভ্যতার একটি বিখ্যাত ক্যালেন্ডার থেকে। মায়া সভ্যতার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আধুনিক মায়া'ন গবেষকদের মতে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল ১১ আগস্ট ৩১১৪ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এবং সেই ক্যালেন্ডারের ব্যাপ্তি পৃথিবী শুরু হওয়া থেকে শুরু করে ৫১২৫ বছর পর্যন্ত। ৫১২৫

বছর পরের তারিখটিকে ১৩.০.০.০ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সেই তারিখটি মায়া-সভ্যতার গবেষকদের মতে ২০১২ সালের ২১ শে ডিসেম্বর ছিল। তাই তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল ২০১২ সালের ডিসেম্বরের ২১ তারিখে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

২০০৯ সালের ১৩ নভেম্বর হলিউডের একটি মুভি মুক্তি পায় যেটি পরবর্তী তিন বছরে সবচেয়ে আলোচিত মুভির তালিকায় ছিল। ডিরেক্টর রোল্যান্ড এমারিচের নির্মিত মুভিটির নাম ছিল '2012'। মুভিটির মূল বক্তব্য ছিল ২০১২ সালে পৃথিবী পানির নিচে তলিয়ে যাবে, ভূখণ্ড বলতে কিছু থাকবে না। এই মুভিটি রিলিজ হবার পর মূলত তোলপাড় শুরু ২০১২ সালে পৃথিবী ধ্বংস হবে!

চীনের *The I King* নামের একটি গ্রন্থে বাইবেলের 'ভালোমন্দের বিচারের চূড়ান্ত পরিণতি'র সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ২০১২ সালকে ইংগিত করা হয়েছে।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দম নিল তাহমিদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পৃথিবী ধ্বংস নিয়ে আর কোনো আলোচিত ভবিষৎবাণী নাই?'

তাহমিদ বলল, 'থাকবে না কেন? আছে তো। যেমন—

জার্মানির বিখ্যাত জোতির্বিদ জোহানেস স্টফারের মতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৫২৪ সালে বন্যায় পুরো পৃথিবী তলিয়ে যাবে। ১ ফেব্রুয়ারির আগে পৃথিবীর অনেক মানুষ উঁচু জায়গায় আরোহণ করে এবং অনেকেই নাকি বিশাল নৌকাও তৈরি করেছিল। সত্যি সত্যি ওই দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হলে মানুষজন স্টফারের আশঙ্কা সত্যি বলে ভাবতে থাকে, শেষে তা ভুল প্রমাণিত হয়।

১৬৬৫ সালে প্লেগ রোগে লন্ডনের অনেক মানুষ মারা যায়। বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ৬৬৬ সংখ্যাটাকে 'বন্য জানোয়ারের প্রতীক' হিসেবে মনে করা হয়। তার ওপর আগের বছরে মহামারী প্লেগ রোগে মানুষের মৃত্যু, তাই অনেকে মনে করেছিল ১৬৬৬ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।'

পৃথিবী ধ্বংসের মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এভাবে গুছিয়ে বলল তাহমিদ; কিন্তু শেষে একটা মন্তব্য করল, 'ওই ধর্মগ্রন্থগুলোতেই দেখবা পৃথিবী ধ্বংস নিয়ে নানানরকম আজগুবি গল্প। যেমন, খ্রিস্টানরা মিলেনিজম বা সহস্রাব্দ তত্ত্বে বিশাস করত। তারা মনে করত ১০০০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে দেখা যায় ভবিষৎবাণীর

যে গুজবগুলো আছে তার বেশিরভাগের মূল ভিত্তি ধর্মগ্রন্থগুলো।'

এই পর্যায়ে তাহমিদের কথা আরজু ধরে বলল, 'তুই এক ধর্মের ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বাকি সব ধর্মকে ভুল বলতে পারিস না, স্পেশালি ইসলাম ধর্ম। এই যেমন ধর—পৃথিবী ধ্বংস তথা কিয়ামত নিয়ে ইসলামে কী বলা আছে সেগুলো দেখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের কিছু আলামতের কথা বলেছেন; কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলেননি কিয়ামত কখন হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ এসে জিজ্ঞেস করত 'পৃথিবী কখন ধ্বংস হবে?' তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ একটি আয়াত নাযিল করলেন। হাতের মোবাইল থেকে সূরা আরাফের ১৮৭ নাম্বার আয়াতের অনুবাদ পড়ে আরজু শোনালো—

> তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, 'তা কখন ঘটবে?' (আপনি) বলুন, 'এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন; আসমান ও জমিনের ওপর তা (কিয়ামত) কঠিন হবে। তা তোমাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে।' তারা আপনাকে প্রশ্ন করছে যেন আপনি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। (আপনি) বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

একজন মুসলিম কখনও 2012 মুভি দেখে, খবর পড়ে শঙ্কায় পড়তে পারে না; কারণ, সে জানে, পৃথিবী ধ্বংসের এই জ্ঞান কোনো মানুষের কাছে নেই। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কথাকে বিশ্বাস করে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেটা জানে না, আর এ না জানার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রি বলো আর বাকিদের কথা বলো সবাই Prank করল।

তাহমিদ হেসে বলল, 'এই দেখো, এখানে তোমাদের আল্লাহ পৃথিবী ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী না করে একটা সেইফ জোনে পৌঁছে গেলেন। কারণ, কোনোকিছুর ভবিষ্যদ্বাণী করলে সেটা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। কুরআন কেন এরকম রিস্ক নেবে? হা হা হা হা।'

‘তার মানে, কুরআনে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নাই, তুই এটা বলতে চাস?’

‘থাকতেও পারে, তবে সেগুলো এমন—যার ভবিষ্যদ্বাণী করার দরকারই নাই। যেমন : ‘আগামীকাল আমি ভাত খাবো’ এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। এটা যদি সত্য হয় তাহলে খুব একটা বিস্মিত হবার কিছু নেই।’

‘তাহলে এবার কুরআন থেকে কয়েকটা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলি, যেগুলো নিয়েও বাজি ধরা হয়েছিল।’

ভবিষ্যদ্বাণী শোনার তৃষ্ণা তখনও আমাদের শেষ হয়নি। আর আরজু যেহেতু অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী বলবে—সেহেতু শোনার তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল।

আরজু বলা শুরু করল, ‘তানভীর, এ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ হিস্ট্রি, তুই নিশ্চয়ই জানিস ৬১৫-৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের সময় রোমান আর পারসিকদের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল?’

তানভীর বলল, ‘হ্যাঁ, আর ওই যুদ্ধে রোমানরা চরমভাবে পরাজিত হয়।’

আরজু বলল, ‘রাইট, আর এই কথাটি পবিত্র কুরআনের ৩০ নাম্বার সূরা, মানে সূরা রূমের দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে।’

তাহমিদ এবার আরজুর কথা ধরে বলল, ‘তাতে কী এমন হলো? তখন তো কুরআন লেখা হচ্ছিল। সেহেতু এই কাহিনিও উল্লেখ করা হয়েছে।’

আরজু হেসে বলল, ‘কুরআন শুধু এই যুদ্ধের কথাই বলে নাই। পরবর্তী যুদ্ধের কথাও বলেছে, যে-যুদ্ধে রোমানরা বিজিত হবে। এর পরের আয়াতে অর্থাৎ সূরা রূমের ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

কিন্তু ওরা (রোমানরা) ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে কয়েক বছরের মধ্যে।

এই আয়াতে যখন রোমানদের কয়েকবছর পর বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন মক্কার বাজারে পৌত্তলিকরা হাসাহাসি করে। তারা বলতে থাকে চরমভাবে রোমানরা হারার পর আবার জিতবে সেটা কল্পনাও করা যায় না।

উবাই ইবনে খালাফ এ নিয়ে আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বাজি ধরেন, তখনও বাজি ধরা ইসলামে নিষিদ্ধ হয়নি।

তারা বাজি ধরেন, তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে রোমানরা পারসিকদের ওপর বিজয়ী হলে উবাই ইবনে খালাফ আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ১০০টি উট দেবে।

৬২৩-৬২৪ খ্রিস্টাব্দে কুরআনের ভবিষৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয় আর রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে।

উবাই ইবনে খালফ তখন বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে একশো উট দাবি করে আদায় করে নেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগুলো নিয়ে গেলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এগুলো যেহেতু জুয়া খেলে পাওয়া উট; সুতরাং, এগুলো সাদাকা করে দাও। এই ঘটনার পর অনেক পৌত্তলিক ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাহমিদের দিকে তাকিয়ে আরজু বলল, 'এরকম একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির পক্ষে তৎকালীন অন্যতম শক্তিশালী পারসিকদের পরাজিত করার ভবিষ্যদ্বাণী কি অক্টোপাস পলের খেলার আগের দিনের ভবিষৎবাণী করার চেয়েও বিস্ময়কর না?'

তাহমিদ বিদ্রুপের সুরে বলল, 'এরকম একটা কাকতালীয় ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেলে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় না যে, কুরআন আল্লাহর বাণী!'

'কেবল এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আরও দুটি বিস্ময়কর তথ্য আছে। সূরা রুমের ৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে।

আরজুর কথা শেষ না হতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন দিন?'

'যেদিন রোমানরা পারসীয়দের পরাজিত করবে সেই দিন।'

'রোমানদের জয়ে মুমিনরা আনন্দিত হবে কেন?' কিছুটা কৌতূহলীস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

আরজু বলে চলল, ‘কারণ, ঠিক যেদিন রোমানরা পারসীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করে ঠিক সেই দিন মুসলিমরা মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে বদর প্রান্তরে যুদ্ধে জয়লাভ করে। এখনকার মতো তখন এরকম ইন্টারনেট একসেস ছিল না, বিবিসি, CNN, Aljazera'র মতো টিভি চ্যানেলগুলো যুদ্ধের লাইভ টেলিকাস্ট করেনি। এতোটাই দৃঢ়তার সাথে এটা বলা ‘যেদিন রোমানরা পারসীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করবে সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে’ এটা কীভাবে সম্ভব, যদি কুরআন আল্লাহর প্রেরিত ওহী না হতো?’

তাহমিদ এর উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আর দ্বিতীয় বিস্ময়কর ঘটনা কী?’

এবার আরজু প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, বল তো, পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্নতম পয়েন্ট কোনটি?’

বিসিএসের পড়া শুরু করা তাহমিদ তখন বলল, ‘মৃত সাগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪২৩ মিটার নিচে।’

এবার আরজু মোবাইল বের করে সূরা রূমের ২ নাম্বার আয়াতের আরবী তেলাওয়াত করে পরে বাংলায় অনুবাদ করে বলল—

রোমানরা পরাজিত হয়েছে (আরবের) নিকটবর্তী অঞ্চলে।

এখানে নিকটবর্তী বলতে যে আরবী শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো ‘আদনা’। আদনা শব্দের দুটো অর্থ। এক অর্থ নিকটবর্তী আর আরেক অর্থ নিম্নতম।

আমরা জানি, রোমান আর পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল আরবের নিকটবর্তী অঞ্চলে, অর্থাৎ হিজাযের উসচি-পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন সিরিয়ার আযরুআত ও বসরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। আবার ওই অঞ্চলটা ছিল আজকের মৃত সাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

এখানে ‘আদনা’ শব্দের দুটি অর্থের যেকোনো একটি নিলেও আয়াতের প্রাসঙ্গিকতার সাথে মিলে যায়। অঞ্চল হিসেবে সেটা আরবের নিকটবর্তী অন্যদিকে নিম্নতম হিসেবে সেটা পৃথিবীর সর্বনিম্ন অঞ্চল।’

এই বলে থামল আরজু। তাহমিদ আবার যাতে এটা না বলে যে ‘এটাও কাকতালীয়’ সে-জন্য আরজু আরেকটা উদাহরণ দিল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি ফিরআউনের লাশ সংরক্ষণ করবেন। সূরা ইউনুসের ৯২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকো।

আশ্চর্যজনভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রমাণিত হয় ১৮৯৮ সালে। দ্বিতীয় রেমেসিসের উত্তরাধিকারী মানেপতহ'র অর্থাৎ ফেরাউনের সংরক্ষিত মরদেহ King's Valley'র থিবস শহরে আবিষ্কৃত হয়।

পরে ফেরাউনের মরদেহ নিয়ে গবেষণা করেন ড. মরিস বুকাইলি। কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর গবেষণা করে এবং সেগুলো বাইবেলের সাথে তুলনা করে লেখেন তার বিখ্যাত বই *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*।

এই সব ভবিষ্যদ্বাণী যেগুলো কয়েক বছর এমনকি কয়েক শতাব্দির পর প্রমাণিত হয় সেগুলোকেও কি 'কাকতালীয়' বলবে?'

ইসলামের মিরাকলগুলোকে 'কাকতালীয়' বলতে বলতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, তাহমিদ আর 'কাকতালীয়' শব্দটা উচ্চারণ করার মতো অবস্থায় নেই। সে ভাবছে, চিন্তা করছে।

চিন্তাভাবনা সবসময় মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পরিচালিত করতে পারে না। যেমনটা পারেনি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরাকে।

পবিত্র কুরআনের সূরা মুদ্দাসসিরে আল্লাহ বলেন—

নিশ্চয় সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অতঃপর সে ধ্বংস হোক! কীভাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল?[১]

[১] সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ১৮-১৯

কালোজিরার হাদীস নিয়ে যত কানাঘুষা

একটা বক্স হাতে FBS এর দিকে আরজুকে যেতে দেখলাম। ডাক দেবার পর থামলে জিজ্ঞেস করি, কই যাচ্ছিস?

'ক্যান্সার আক্রান্ত এক মায়ের জন্য টাকা তুলতে যাচ্ছি।'

এরকম জনহিতকর কাজে সবসময়ই এগিয়ে আসে আরজু, তবে কাউকে বলে না, এমনকি আমাকেও যেতে বলে না। ভাবলাম, এমনিতেই তো ফ্রি আছি, তাই আরজুর সাথে যাই।

সবার কাছে গিয়ে ওই অসুস্থ মায়ের দুর্দশার কথা বলতে থাকলাম। যে যেরকম পারছে দানবক্সে টাকা দিচ্ছে, কেউ ১০ টাকা, কেউ ২০ টাকা, আবার একটু আগে একজন ১০০০ টাকারও একটা নোট দিলেন।

ডাকসুর সামনে যেতে বিপ্লব ভাইকে দেখলাম—সিগারেটের ধোঁয়া আকাশের দিকে ছেড়ে ওই ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিপ্লব ভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলে ক্যান্সার আক্রান্ত ওই মায়ের জন্য সাহায্য চাইলাম।

বিপ্লব ভাই হেসে বললেন, 'টাকা তুলে আর কী করবা, তার চেয়ে বরং ওই মাকে সামান্য কালোজিরা খাওয়াও। ঠিক হয়ে যাবেন।'

এরকম মুহূর্তে বিপ্লব ভাইয়ের মজা নেওয়া দেখে আমার একটু বিরক্তি লাগল, বেচারা সিচুয়েশনও বোঝেন না। বিরক্তির সুরে বললাম, ‘ভাই এগুলো কী বলছেন, ক্যান্সার হয়েছে, এরমধ্যে কালোজিরা খাইয়ে কী হবে?’

বিপ্লব ভাই হাসলেন, হাসি থামিয়ে বললেন, ‘তোমাদের নবী নাকি বলেছেন, ‘কালোজিরা সকল রোগের ওষুধ’(!) তাহলে আবার টাকা তুলে ক্যান্সার রোগীদের সাহায্য করার দরকার কী? কালোজিরা খাওয়ালেই তো হয়।’

বিপ্লব ভাই যেটা বলছেন, সেটা তো আসলেই সত্যি। ছোটবেলায় এরকম ওয়াজ শুনেছিলাম যে, কালোজিরা খাইলে সব রোগ কমে যায়, তাহলে ক্যান্সার রোগীকে কালোজিরা খাওয়ানো হয় না কেন? নাকি এই হাদীসটা অযৌক্তিক!

আরজু বিপ্লব ভাইকে পাল্টা প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা ভাই, আপনি কি এই হাদীসটি কোনো হাদীসগ্রন্থ কিংবা কোনো হাদীসের এ্যাপস থেকে পড়েছেন?’

বিপ্লব ভাই অনেক রেগে গিয়ে বললেন, ‘তার মানে, আমি কি মিথ্যা বলছি? এটা *বুখারী শরীফের* হাদীস।’

আরজু বলল, ‘ভাই আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি জানতে চাচ্ছিলাম হাদীসটা আপনি কোত্থেকে জেনেছেন? কোনো ব্লগ থেকে নাকি হাদীসের বই থেকে।’

বিপ্লব ভাইয়ের কণ্ঠ এখন একটু নরম হলো, তিনি বললেন, ‘আমি ব্লগ থেকে জেনেছি।’

আরজু হাসল, ‘আমি জানতাম এরকমই হবে। আপনারা হাদীস শেখেন ব্লগে ঢুকে, হাদীসের এতোগুলো বই বাদ দিয়ে যেখানে ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখি হয়— সেখানে যান হাদীস শিখতে।’

আরজুর কথা শুনে বিপ্লব ভাই সত্যি সত্যি রেগে গেলেন, আরজুকে শাসিয়ে বললেন, ‘হইছে হইছে, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ক্যান্সার রোগীকে তোমাদের নবীর কথামতো কালোজিরা খাওয়াও না কেন?’

আরজু বলল, ‘আপনার বলা মিথ্যা হাদীসটির সংশোধন আগে করে নিই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কালোজিরা সাম ব্যতীত সকল রোগের

উপশম (healing)। সাম মানে হলো মৃত্যু।[১]

ভালো করে দেখুন এখানে ওষুধ বলা হয়নি, বলা হয়েছে উপশম বা healing। এখন বলুন, উপশম আর ওষুধ কি এক হয়?'

নিজের ভূয়া তথ্যের জালে নিজেই আটকে গিয়ে বিপ্লব ভাইয়ের মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বের হচ্ছে না।

আরজু বলে চলল, 'তবে কালোজিরাতে এমন সব উপাদান আছে—যা ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পথপ্রদর্শক ইবনে সিনা তার বিখ্যাত গ্রন্থ *কানুন ফিত তিবব* (Canon Of Medicine) গ্রন্থে বলেছেন, কালোজিরা দেহের প্রাণশক্তি বাড়ায় এবং এরমধ্যে শতাধিক পুষ্টি উপাদান রয়েছে যার মধ্যে ২১ শতাংশ প্রোটিন, ৩৮ শতাংশ শর্করা, স্নেহ পদার্থ ৩৫ শতাংশ এবং বাকি অংশ ভিটামিন ও খনিজ।'

বিপ্লব ভাই বললেন, 'এগুলো তো তোমাদের নবীর হাদীস ডিফেন্ড করতে গিয়ে ইবনে সিনা বলেছেন। তিনি তো কালোজিরার পক্ষেই সাফাই গাইবেন।'

আরজু হাসল, 'আপনাদের নিয়ে পারিও না! আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার জোসেফ মেরকোলার (Joseph Mercola) নাম শুনছেন?'

বিপ্লব ভাই 'না সূচক' মাথা নাড়লেন।

আরজু বলে চলল, তিনি হলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার। *Fat for fuel : A Revolution, The No-Grain Diet* এরকম কয়টি বিখ্যাত বইও লেখেন। কালোজিরা নিয়ে ৬৫০ টি রিসার্চ করা হয় তার অধীনে। এই রিসার্চ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বলেন—

> কালোজিরার মধ্যে ফার্মাকোলজিকাল কমপক্ষে ২০ টি উপাদান আছে। তার মধ্যে থাইমোকুইনোন (Thymoquinone) হলো এন্টি-ক্যান্সারের জন্য ব্যবহৃত উপাদান।

---

[১] *সহীহ বুখারী,* ৫৬৮৮ *জামে তিরমিযী* ২০৪১, *সুনানু ইবনি মাজাহ* ৩৪৪৭

এছাড়াও আমাদের অগ্ন্যাশয়ের বিটা নামক কোষের ওপর অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে এর কার্যকারিতা কমে যায়। আর এই বিটা কোষের কাজ হলো ইনসুলিন নামক হরমোন নিঃসরণ করা। ইনসুলিন আমাদের রক্তের গ্লুকুজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে; কিন্তু অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন হরমোন নিঃসরণ কমে যায়। তখন আমাদের ডায়াবেটিস রোগ হয়।

কিন্তু কালোজিরা খেলে এতে উপস্থিত উপাদান আমাদের কোষসমূহের ওপর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। এতে কোনো ব্যক্তির ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যায়।

বিপ্লব ভাই হাতের সিগারেটে শেষ টান দিলেন।

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি, রোগ হলে কালোজিরা খেতে, তিনি বলেছেন, কালোজিরা খেতে, যাতে—সেটি রোগ প্রতিরোধক শক্তিকে আরও শক্তিশালী করে; কিন্তু হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি বলছেন ওষুধের কথা।'

সিগারেট ফেলে দিয়ে বিপ্লব ভাই পকেট থেকে ১০ টাকা বের করে দানবক্সে রাখলেন।

আমি বললাম, 'বিপ্লব ভাই, সিগারেটের পকেটে কিন্তু লেখা আছে, 'Smoking Causes Cancer' তাই ধূমপানও করুন, কালোজিরাও খান।' আমার কৌতুক শুনে বিপ্লব ভাই হাসলেন।

আমরা চললাম পরবর্তীজনের কাছে, 'ভাই, আমাদের বন্ধুর মা ক্যান্সারে আক্রান্ত, যদি একটু সাহায্য করতেন...'

কয়েকটি হাস্যকর যুক্তির অপনোদন

আরজুর বাসার যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হলো—আরজুর বইয়ের আলমারি। আলমারিতে বই সাজিয়ে রাখাও যে একটা শিল্প, তা আরজুর বাসায় না এলে বুঝতেই পারতাম না।

আলমারির একেক তাকের ভেতর একেক ধরনের বই। উপন্যাস ক্যাটাগরিতে শরৎচন্দ্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, মানিক বন্দোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদসহ বেশকিছু লেখকের বই। কবিতার ক্যাটাগরিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাসের কবিতার বই। জীবনী বা আত্মজীবনীর ক্যাটাগরিতে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, এপিজে আব্দুল কালামের *Wings of Fire*, ম্যালকম এক্সের *Autobiography* , মুহিউদ্দীন খানের *জীবনের খেলাঘরে*, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী *আর রাহীকুল মাখতুম*, *সিরাতে ইবনে হিশাম*সহ বিভিন্ন আত্মজীবনীর বই এই ক্যাটাগরিতে।

পরের ক্যাটাগরিতে জোকসের বই। গোপাল ভাঁড়ের ১০১টা জোকস, আহসান হাবীবের জোকসের বই; কিন্তু অবাক হলাম এর ঠিক পাশের বইটা দেখে। হুমায়ূন আজাদের *আমার অবিশ্বাস* বইটা রাখা জোকসের ক্যাটাগরিতে। এরকম একটা সিরিয়াস বই যেটা পড়ে অনেকেরই বিশ্বাসের ভীত নড়ে গিয়েছে সে বইটা আরজু কেন জোকসের ক্যাটাগরিতে রাখল—বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম, হয়তো এর পরের প্রবন্ধ ক্যাটাগরিতে না রেখে সে ভুল করে জোকসের ক্যাটাগরিতে রেখেছে। বইটা হাতে নিয়ে উল্টাতে লাগলাম। দেখলাম বেশ কয়েকটা পৃষ্ঠায় সে হাইলাইটার দিয়ে আন্ডারলাইন করে রেখেছে।

মাসখানেক আগে বইটা পড়েছিলাম, বইটা পড়তে গিয়ে যে-সব প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছিল—ঠিক সেই সব লাইনে আরজু আন্ডারলাইন করে রেখেছে।

এমন সময় আরজু ড্রয়িং রুমে ঢুকল। হাতের ট্রেতে নুডুলস আর পানি। টেবিলে ট্রে রাখতে রাখতে বলল, 'কী পড়িস?'

হাতে থাকা *আমার অবিশ্বাস* বইটা দেখালাম। বইটা দেখে এক ফালি হেসে আরজু বলল, ও! জোকসের বইটা?

এবার নিশ্চিত হলাম সে ইচ্ছে করেই বইটা জোকসের ক্যাটাগরিতে রেখেছে। নুডুলসের বাটি আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, বইটা পড়েছিস?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বললাম, 'এরকম একটা সিরিয়াস বই তুই জোকসের ক্যাটাগরিতে রাখলি ক্যান?'

'আসলে বইয়ে দেওয়া কিছু তথ্য আমার কাছে এতোটাই জোকস আর ছেলেমানুষি মনে হয়েছে যে, বইটা পড়ে প্রচুর হেসেছি। তাই জোকসের ক্যাটাগরিতে রাখলাম।'

নুডুলস খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বইয়ের মধ্যে কী এমন জোকস পেয়েছিস—যার ফলে তুই বইটা জোকসের ক্যাটাগরিতে রাখলি?'

আরজু আবারও হেসে বলল, 'হাইলাইটার দিয়ে সেই জোকসগুলো আন্ডারলাইন করা আছে, তুই নিজেই দেখে নে।'

বইটার ৯৭ আর ৯৮ পৃষ্ঠা দেখলাম ভাঁজ করা। বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতেই তাই ওই দুটো পৃষ্ঠায় চলে গেলাম। ৯৭ পৃষ্ঠার সবুজ কালির হাইলাইটার দিয়ে আন্ডারলাইন করা লাইনটা পড়লাম, 'ইসলাম অপৌত্তলিক; কিন্তু এর তলদেশে আরব পৌত্তলিকতার ফল্গুস্রোত সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি।' একই পৃষ্ঠার শেষে হাজরে আসওয়াদ বা কালোপাথরে মুসলিমদের চুমো খাওয়ার বিষয়টা লেখক উল্লেখ করে ইসলামের পৌত্তলিকতার কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

পরের পৃষ্ঠা, অর্থাৎ ৯৮ পৃষ্ঠায় আন্ডারলাইন করা লাইনগুলো পড়তে লাগলাম, 'আরব বেদুইনরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। ওই দেবদেবীদের প্রতীক ছিল বিভিন্ন পাথর। পাথরগুলো কখনও হতো মূর্তি, কখনও বিশালাকার খণ্ড।' তার

দুই লাইন পরে লেখক রেফারেন্স দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, ‘দ্বিতীয় শতকের শেষদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট লিখেছেন, আরবরা পাথরের পূজা করে, ওই শতকেই ম্যাক্সিমাস টাইরিউস লিখেছেন, আমি জানি না, আরবরা পূজা করে কোন দেবতার—যাকে তারা রূপায়িত করে চতুর্ভুজ পাথররূপে।’

আন্ডারলাইন করা লাইনগুলো পড়ার পর আরজুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখানে হাস্যকর কী পাইলি তুই?’

আরজু বলল, ‘দেখ, এখানে লেখক বলেছেন, ইসলাম অপৌত্তলিক হলেও তলদেশে পৌত্তলিকতা আছে। আর উদাহরণ হিসেবে লেখক হাজরে আসওয়াদ এর কথা বলেন—যা নাকি পাথরপূজার শামিল।’

বইয়ের লেখাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, ‘লেখক রেফারেন্স দিয়েছেন দ্বিতীয় শতকের যখন আরবরা পাথরের পূজা করত। তুই তো জানিস, কাবাঘরে তখন ৩৬০টা মূর্তি ছিল। তাহলে লেখকের রেফারেন্সের মধ্যে ভুল খুঁজে পেলি কোথায়?’

‘দেখ, লেখক প্রথমেই অভিযোগ করেছেন যে, মুসলিমরা পাথরপূজা করে এখনও। যার রেফারেন্স দিতে গিয়ে আগেকার আরবদের পাথরপূজার বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। পাথরপূজার রেফারেন্স শেষে তিনি নিজস্ব ভাষ্যে লেখেন, মুসলিমরা তীর্থে গিয়ে চুমো খায় একটা কালো পাথরকে। এটা একসময় নির্দেশ করত উর্বরতা।’

রেফারেন্স দেওয়া উক্তি শেষে দেখলাম—আসলেই লেখক পরবর্তী লাইনে হাজরে আসওয়াদে চুমো খাওয়ার কথাটি বলেছেন।

আরজু নুডুলস খেতে খেতে বলল, ‘কিন্তু হাস্যকর হলো, লেখক তার আগের পৃষ্ঠায়ই এর উত্তর দিয়েছেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে। আগের পৃষ্ঠায় লেখক লেখেন, খলিফা উমার কাবাঘরের কালো পাথরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যদি না আমি দেখতাম মহানবী তোমাকে চুমো খাচ্ছেন, আমি নিজে তোমাকে চুমো খেতাম না।’ মজার ব্যাপার হলো, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি লেখক আংশিক বর্ণনা করেছেন, পুরোটা বর্ণনা করলে সহজেই বোঝা যেত যে, মুসলিমরা পাথরপূজা করে না। *সহীহ মুসলিমের* ২৯৫৯ নাম্বার হাদীসে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কালো পাথরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে চুম্বন করব এবং আমি অবশ্যই জানি, তুমি একটা পাথর,

তুমি কারও ক্ষতিও করতে পারো না এবং উপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমায় চুম্বন করতাম না। মক্কা বিজয়ের দিন তো বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কাবাঘরের ওপরে উঠে আযান দিয়েছিলেন।

এখানে দেখ, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা বলে শুরু করেছেন যে, এই পাথর মানুষের কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। কোনো পাথরপূজারী তার পূজনীয় পাথরকে উদ্দেশ্য করে এটা বলতে পারবে না যে, সেই পাথর তার কোনো কল্যাণে আসবে না। এ থেকেই তো বোঝা যায় যে, হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া মানে পাথরপূজা নয়। অথচ লেখক সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে হাদীসের রেফারেন্স দিয়েছেন, যদিও আংশিক হাদীস।'

জোকস বলা শেষ হলে যেমন মানুষ হাসে, আরজু ওইভাবে হাসতে লাগল।

তারপর আন্ডারলাইন করা আরও পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলাম। ৭৭ পৃষ্ঠায় লেখা দেখলাম, 'নাস্তিক হত্যা আর ধ্বংস করে না, কিন্তু ধার্মিক সবসময় হত্যা আর ধ্বংসের জন্য ব্যগ্র থাকে, তারা ইতিহাসের পাতাকে যুগে যুগে রক্তাক্ত করেছে। প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে অসংখ্য সন্ত, যারা ঠান্ডা মস্তিস্কের হত্যাকারী।'

এই লাইনগুলো পড়ার পর আরজু জিজ্ঞেস করল, 'তোর মোবাইলে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি আছে? থাকলে মোবাইলটা বের কর।'

আমি মোবাইল বের করলে আরজু বলল, 'World's most devastating war লিখে গুগলে সার্চ দে তো।'

'World's most devastating war' লিখে গুগলে সার্চ দিলে সার্চ রেজাল্টে প্রথমে বিবিসির একটি প্রতিবেদন এলো। শিরোনাম : World War Two : History's most savage and devastating war. বিস্তারিত পড়ে দেখলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলো বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ৫০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়।

Charles Philips এবং *Alan Axerlod The Encyclopedia of War বা যুদ্ধের বিশ্বকোষ* নামে একটি বই লেখেন। বইটিতে তারা মানব ইতিহাসের শুরু থেকে আজ

পর্যন্ত ১৭৬৩ টি যুদ্ধ গণনা করেছেন। তার মধ্যে ১২৩ টি যুদ্ধের কারণ ছিল ধর্ম। অর্থাৎ মাত্র ৭ % যুদ্ধের কারণ ছিল ধর্ম, বাকি ৯৩ % যুদ্ধের কারণ ধর্ম ছিল না। যুদ্ধে নিহত মোট সংখ্যার মাত্র ২ % ধর্মীয় যুদ্ধে নিহত হয়।

আরজু বলল, 'একটু খোঁজ নিয়ে যদি দেখিস, তাহলে দেখতে পাবি যে, এই সব যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা কেউই ধার্মিক ছিল না। হিটলার জাতিগত আধিপত্য বিস্তারের জন্য মানুষ হত্যা করেছেন, ঠিক তেমনটি ইতালির মুসোলিনি আর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের স্ট্যালিনও করেছে। বইটির সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো, মুসোলিনি আর স্ট্যালিন দুজনই ছিলেন নাস্তিক আর তারা বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অথচ *আমার অবিশ্বাস* বইয়ে লেখক লেখেন, 'নাস্তিক হত্যা আর ধ্বংস করে না, কিন্তু ধার্মিক সবসময় হত্যা ও ধ্বংসের জন্য ব্যগ্র থাকে'। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়—যত বড় বড় যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে তার পেছনে ধর্মীয় কারণের চেয়েও জাতিগত আধিপত্য বিস্তারের কারণটি বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

আরজু আবারও ৯৭ নাম্বার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখাল, 'এই দেখ, লেখক লিখেছেন, 'ইসলামপূর্ব আরব ছিল মাতৃপ্রধান, ইসলামে ঘটে পিতৃত্বের উত্থান।' কথাটা কী রকম ভ্রান্ত—সেটা জানতে ইসলামের ইতিহাসের বই লাগবে না উইকিপিডিয়াতে-ই দেখতে পাবি।'

হাতে থাকা মোবাইল দিয়ে উইকিপিডিয়ায় সার্চ দিলাম Women in pre-Islamic Arabia লিখে।

উইকিপিডিয়ার রেজাল্টে এলো Family Structure and Motherhood শিরোনামে, Arabia was patriarchal and the relations in the family were between other relations with men.—অর্থাৎ আরবের পরিবার-ব্যবস্থা ছিল পুরুষতান্ত্রিক এবং সম্পর্কগুলো নির্ধারিত হতো পুরুষ দ্বারা।

আরজু বলল, 'তাছাড়া তৎকালীন আরবে কন্যা সন্তানকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো সেই ঐতিহাসিক সত্য প্রায় সব ইতিহাসবিদ মেনে নিয়েছেন। একটা পশু যে পরিমাণ অধিকারের দাবি রাখত, একজন নারীকে সেরকম অধিকারও দেওয়া হতো না। পুরুষেরা ব্যাবসা করলেও নারীরা ব্যাবসায় অংশগ্রহণ করতে পারত না, একমাত্র সম্ভ্রান্ত কিছু পরিবারের নারী ছাড়া। হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে-সম্পদ অর্জন করেছিলেন সেটাও উত্তরাধিকারসূত্রে; আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা হওয়ায় কেবল ব্যাবসা করতে পারতেন। অথচ লেখক বলেন, আগের আরব

ছিল নাকি মাতৃপ্রধান। 'দিন-দুপুরে ডাকাতি' বলতে এরকম ঐতিহাসিক তথ্যের মিথ্যা উপস্থাপনকেই হয়তো বোঝায়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এই জন্যই কি বইটা তাহলে জোকসের ক্যাটাগরিতে রেখেছিস?'

আরজু হেসে বলল, 'এরকম ভুল তথ্য উপস্থাপন আরও অনেক লেখকই করেছেন; কিন্তু *আমার অবিশ্বাস* বইয়ে লেখক যা করেছেন তা অতিমাত্রায়; কিন্তু বইটা জোকসের ক্যাটাগরিতে রেখেছি এই কারণে যে, তিনি সাহিত্যের একজন মানুষ হয়ে সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী যাকে বলা হয় সেই স্যার আইজ্যাক নিউটনকে 'কুসংস্কারগ্রস্ত' বলেছেন কেবলমাত্র নিউটন ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন—এই জন্য।

আরজু বইটার ১১৯ পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখাল, 'বিজ্ঞানীমাত্রই মুক্ত মনের মানুষ নন, বহু বিজ্ঞানী ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা অত্যন্ত কুসংস্কারগ্রস্ত ছিলেন; যেমন—নিউটন, ও সাম্প্রতিক সালাম।'

'বিজ্ঞানী নিউটন মুক্তমনা মানুষ না অথচ আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যে পড়া মানুষেরা মুক্তমনা মানুষ। আবার আলবার্ট আইনস্টাইনের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে একই পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, আইনস্টাইন মহাবিজ্ঞানী; কিন্তু কোনো মহাবিজ্ঞানী বিধাতায় বিশ্বাস করলেই কি বিধাতা প্রমাণিত হয়ে যান? বিজ্ঞানীরাই কি বিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞ? বিধাতা সম্পর্কে শেষ কথা কি শুনতে হবে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে? বিজ্ঞানীদের মুখে বিধাতা আছেন শুনে যারা মনে করে প্রমাণিত হয়ে গেছেন বিধাতা, আর কোনো সন্দেহ নেই তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তারা আসলে অবিশ্বাসী।'

মজার ব্যাপার হলো, যেসব বিজ্ঞানী আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, লেখক তাদের বেলায় বলেছেন 'বিজ্ঞানীরাই কি বিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞ?' অথচ 'বিধাতার অস্তিত্ব নেই' সেই কথার রেফারেন্স দিতে তিনি কিংবা এরকম নাস্তিকরা বিজ্ঞান খোঁজেন, উদাহরণ টানেন চার্লস ডারউইন, স্টিফেন হকিংদের।

এরকম হাস্যকর ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের জন্যই আমি বইটা জোকসের ক্যাটাগরিতে রেখেছি।'

তাদের অন্তরে আসলেই কি আল্লাহ মোহর মেরে দেন?

ক্লাসের সবচেয়ে কড়া স্যার, বিশেষ করে অংক আর বিজ্ঞানের স্যারদের আসল নাম ছাড়াও ছাত্ররা তাদের স্যারের অনুপস্থিতিতে আরও বিভিন্ন নামে ডাকে। আমাদেরও একজন স্যারকে অনেকে 'ফিউজ স্যার' নামে ডাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে ফিউজ স্যারের মতো কড়া স্যার আর আছেন বলে মনে হয় না। স্যারকে এরকম নামে ডাকা আরজুর পছন্দ না। সে বলে, মানুষকে মন্দ নামে ডাকতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

সেদিন স্যার ক্লাস ঢুকলেন, সাধারণত ক্লাসে ঢুকেই স্যার রোল কল করা শুরু করেন। যখন স্যার রোল কল করা শেষ করলেন, তখন আমার মনে হলো যে, আমি আমার এটেন্ডেন্স দিইনি। যখনই স্যারকে বলতে যাব তখন 'May I come in sir' বলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্যারের অনুমতি চাইল আরজু। সাধারণত আরজু ১ মিনিটও দেরি করে আসে না, আজ হঠাৎ কেন দেরি করল—কে জানে। স্যার আরজুকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেন।

লেকচার শুরু করার আগে স্যার বললেন, 'আজকে একটা গল্প বলে লেকচার শুরু করব।' সাধারণত লেকচার শুরুর আগে স্যারের গল্পগুলো হয় ধর্মকে আঘাত করে, আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে মনে হলো। স্যার গল্প বলা শুরু করলেন,

'আমি আসলে কুরআন তেমন একটা পড়ি না। গতকাল আমার ওয়াইফের অনুরোধে একটু পড়তে লাগলাম। আরবী তো পড়তে পারি না, তাই দেখে দেখে ইংরেজী অনুবাদ পড়া শুরু করলাম। শুরুর দিকের সূরা বাকারা পড়তে গিয়ে তো আমি শকড খেলাম। শুরুর দিকে একটা আয়াতে বলা আছে 'Allah has set a seal upon their

(disbelievers) hearts' অর্থাৎ আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে সিল মেরে দিয়েছেন—যাতে তাদের অন্তরে সত্য প্রবেশ না করে। এখন বলো, আল্লাহ যদি কাফিরদের অন্তরে সিল মেরে দেন তাহলে কীভাবে তারা সত্য বুঝতে পারবে? আর তারা যেহেতু সত্য বুঝতেই পারবে না তাহলে কেনই-বা আল্লাহ তাদের জাহান্নামের শাস্তি দেবেন?'

এই বলে স্যার আমাদের সবার দিকে তাকালেন। বিবিএর শিক্ষার্থীরা কুরআনের ব্যাখ্যা আর কী জানবে? সবাই হা করে তাকিয়ে আছে। তারপর স্যার চোর আর পুলিশের উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন যে, চোরেরা যদি দেশের আইন না জানে তাহলে তো চুরি করবেই। তাই আইনপ্রণেতাদের উচিত, দেশের আইন আর চুরির শাস্তিগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরা। আইন না জানিয়ে 'অন্তরে মোহর' মেরে তো আর তাদের শাস্তি দেওয়া যায় না। চোর-পুলিশের উদাহরণ শেষে স্যার ক্লাস-লেকচার শুরু করলেন। স্যারের আগের প্রশ্নগুলোর উত্তর কেউই দিল না।

ক্লাস শেষে আমি দৌড়ে স্যারের কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার আমি এটেন্ডেন্স দিইনি।'

স্যার বললেন, 'You missed once, missed it forever.'

আরজুও আমার মতো দৌড়ে আসছিল, ভাবলাম সেও হয়তো এটেন্ডেন্সের জন্য অনুরোধ করতে আসছে। কিন্তু আরজু বলল, 'স্যার, আজকের ক্লাস লেকচার নিয়ে আমার কিছু কথা বলার ছিল।'

আরজুর দিকে ভালো করে তাকিয়ে স্যার বললেন, 'আসো আমার সাথে।'

আমিও চললাম স্যার আর আরজুর পেছনে। স্যার তার ব্যক্তিগত রুমে ঢুকলেন, আমাদেরও ঢোকার জন্য বললেন। অত্যন্ত পরিষ্কার একটা রুম, ঢোকার আগেও এসি অন করা ছিল; তাই রুমে ঢোকার পর এসির ঠান্ডা বাতাসে শরীরে শিহরন লাগল। স্যার আমাদের বসতে বললে আমরা বসলাম। এসি বন্ধ করে সিগারেট ধরানোর আগে স্যার আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'সিগারেট খেলে তো তোমাদের কোনো অসুবিধা নাই?'

আমি আর আরজু সমস্বরে বললাম, 'না স্যার।'

'এবার বলো তোমাদের কী কথা বলার ছিল?'

'স্যার আপনি কুরআনের যে-আয়াতের কথা বলছেন, ওই ব্যাপারটা নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম।'

স্যার তার মোবাইল বের করে আমাদের কুরআনের ওই আয়াত পড়তে দিয়ে বলেন, 'এই দেখো, আমি ভুল বলেছি নাকি? তোমাদের কুরআনেই তো এটা লেখা আছে।'

সূরা বাকারার ৬-৭ নাম্বার আয়াত পড়া শুরু করলাম—

নিশ্চয়ই যারা অস্বীকার করে (কাফির), তাদের তুমি সাবধান করো আর না-করো একই কথা—তারা স্বীকার করবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে এবং শোনার ক্ষমতার ওপর সিল মেরে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টির ওপরে আছে এক পর্দা। তাদের জন্য আছে এক প্রচণ্ড শাস্তি।

আয়াতগুলো পড়ে আমার মনে হলো, আসলেই তো। তাদের অন্তরে যদি আল্লাহ সিল মেরে দেন তাহলে তাদেরই-বা দোষ কোথায়।

আরজু প্রথমে এই দুই আয়াত আরবীতে পড়ল। কী সুললিত কণ্ঠস্বর! প্রাণ জুড়িয়ে গেল। তারপর বলল, 'স্যার, এখানে 'ইন্নাল্লাযিনা কাফারু' হচ্ছে একটি অতীত ক্রিয়াবাচক বাক্য। যার বাংলা অর্থ, যারা অস্বীকার করবে বলে মনে স্থির করে ফেলেছে বা যারা অস্বীকার করেছে এবং করবেই। ইসলামের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই, এমন কিছু কাফির ছিল—যারা স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়ার পরও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ তো করেনি; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে অপপ্রচার চালিয়েছে।'

আরজুর কথা শোনার পর আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম অপপ্রচার?'

আরজু বলল, 'তারা যখন বলল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি চাঁদকে দু-টুকরো করেন, তবে তারা ঈমান আনবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদকে দু-টুকরো করলে তারা বলে, 'এ তো নির্ঘাত যাদুকর, যার যাদু আকাশেও কাজ করে' (নাউজুবিল্লাহ)। এরকম অসংখ্য নিদর্শন পাওয়ার পরেও তারা ঈমান না এনে বিভিন্ন অপপ্রচার চালায়।'

আরজুর কথা শেষ হলে স্যার বললেন, ‘বুঝলাম, My son! এবার বলো, তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেবেন কেন?’

‘স্যার, মোহর দেবার আগে সাবধানের কথা এসেছে। আর এ সাবধানতা বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো ‘ইনযার’। ইনযার হচ্ছে ভালোবাসার মাধ্যমে, উৎসাহের মাধ্যমে সাবধান করা—যাতে মানুষ ভুল না করে। যেমন, মা সন্তানকে আগুনে হাত না দেবার জন্য সাবধান করেন সেরকম। বারবার বলার পরেও সন্তান যখন মায়ের কথা শোনে না তখন একসময় মা বলে ওঠেন, ‘এই ছেলে আর শোধরাবে না।’ ঠিক একইভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই যারা অস্বীকার করে (কাফির), তাদের তুমি সাবধান করো আর না করো একই কথা—তারা স্বীকার করবে না।’ অর্থাৎ, সত্য পেয়েও গ্রহণ না করার ফলে তাদের অন্তরে মোহর লেগে যায়।’

স্যার বললেন, ‘কিন্তু মোহর মারার বিষয়টা আমার এখনও মাথায় ঢুকছে না।’

‘আপনার প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআনে সূরা মূনাফিকুনের ৩ নাম্বার আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে—

এটা এজন্য যে তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে।

স্যারের মুখভঙ্গি দেখে মনে হলো, আরজুর এই কথায়ও স্যার তার উত্তর খুঁজে পেলেন না।

এবার আরজু স্যারকে বলল, তিনি যে সিগারেট খেয়েছেন সেটার প্যাকেটটা দেবার জন্য। স্যার সিগারেটের প্যাকেট দিলে আরজু বলল, ‘স্যার, এই দেখুন, এখানে কী লেখা?’ আমি আর স্যার তাকিয়ে দেখলাম সেখানে লেখা, Smoking is injurius for health অর্থাৎ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

আরজু একটু হাসল, তারপর আবার বলা শুরু করল, ‘স্যার, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ, এই লেখা পড়েও আপনি সিগারেট খাচ্ছেন। এমনকি পৃথিবীর কোনো ধূমপায়ী এই লেখা পড়ে ধূমপান করা বাদ দিয়েছে এরকম ঘটনা নেই। তাহলে দেখুন, এখানে ধূমপান করার ক্ষতিকর দিকগুলোর কথা বলা হয়েছে তবুও কি মানুষ ধূমপান করা বাদ দিয়েছে?’

আরজুর প্রশ্নের উত্তর কী দেবেন স্যার ভেবে পাচ্ছেন না। আরজু বলে চলল, 'এই সিগারেটের কাভারে যদি লেখা থাকে, 'যারা এই সিগারেট খায় তাদের সিগারেট না খেতে বলুন আর যাই বলুন তারা খাবেই। তারা শিক্ষিত হলেও তাদের অন্তরে মোহর দেওয়া হয়েছে, তারা কখনও সিগারেট খাওয়া ছাড়বে না। একসময় তাদের শরীর ভেঙে পড়বে, তাদের ফুসফুসে ক্যান্সার হবে এবং তারা মারা যাবে।' এই কথা কি খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে গেল, স্যার?'

স্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিছু বলছেন না। একসময় বসা থেকে উঠে গিয়ে আমাদের এটেন্ডেন্স খাতা এনে বললেন, তোমাদের রোল বলো?' স্যারের কথা শুনে আমার বুক ধড়ফড় করা শুরু করল। তর্কে হারার ক্ষোভ মেটাতে গিয়ে যদি আমাদের মার্ক কেটে ফেলেন! আমি আর আরজু আমাদের রোল বললাম। স্যার ওই দিনে আমাদের এটেন্ডেন্স দিয়ে বললেন, 'যাও আজকে তোমাদের এটেন্ডেন্স দিয়ে দিলাম।'

স্যারের রুম থেকে বের হবার পর আমি আরজুকে বললাম, 'সত্যিকারের মুক্তমনা তো এদেরই বলে, যারা অন্যের যুক্তিটা সত্য হলে সেটা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়।'

আমার কথা শুনে আরজু বলল, 'তুই তো দেখি সত্যিকারের মুক্তমনাদের চিনে ফেলেছিস!'

মুসলিমরা নাস্তিক হয়, নাস্তিকরা আস্তিক হয় না কেন?

মাঝে মাঝে আমরা টিএসসিতে আড্ডা দিতে যাই। বিকেলবেলা আমি আর আরজু মিলে টিএসসির দিকে যাচ্ছি, ওখানে অপেক্ষা করছে মাহির, শিহাব, হাবীব আর নাঈম। হল থেকে বের হবার পর টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সঙ্গে নেই ছাতা। যত দ্রুত সম্ভব হাঁটা শুরু করলাম। ডাকসুর সামনে যাবার পরই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি, ইংরেজিতে যাকে বিড়াল-কুকুরের বৃষ্টি বা Cats And Dogs Rain বলা হয়। আশেপাশের সবাই দৌড়ে ডাকসুর ক্যান্টিনে ঢুকছে, আমরাও ঢুকলাম।

চেয়ার টেনে যখন বসতে যাব তখন ক্যান্টিনের কর্ণারে বসে থাকা এক লোক 'আরজু' বলে ডাক দিলেন। ওই দিকে তাকিয়ে দেখলাম, শুভ ভাই আমাদের ইশারা করছেন তার কাছে যাবার জন্য। শুভ ভাইকে আমি চিনি আরজুর মাধ্যমে। আরজু প্রায়ই তার সাথে আড্ডা দেয়। দেখলাম, শুভ ভাই ল্যাপটপে কী যেন টাইপ করছিলেন এতোক্ষণ। আমাদের চেয়ারে বসার ইশারা করে শুভ ভাই আবারও কী যেন টাইপ করা শুরু করেন। ২-৩ মিনিট পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাক, লেখা শেষ করলাম এতোক্ষণে। তোমাদের কী খবর?'

কুশলাদি বিনিময়ের পর আরজুর দিকে ল্যাপটপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আরজু দেখ তো, লেখাটাতে কিছু মিসিং আছে কি না? ব্লগে পোস্ট করব।'

অনেক বড় একটা লেখা, আরজু পড়া শুরু করল। আরজু পড়ছে আর শুভ ভাই আরজুর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছেন। পড়া শেষে আরজু বলল, 'টপিক

ঠিকই আছে, সুন্দর করে গুছিয়েও লিখেছেন। পরের পর্ব লিখবেন না?'

হাসি থামিয়ে শুভ ভাই বললেন, 'পরের পর্ব মানে?'

এবার আরজু হেসে বলল, 'মানে এটা তো লিখেছেন আস্তিক থেকে যারা নাস্তিক হয়ে গেছে তাদের নিয়ে, পরেরটা লিখবেন যারা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছে তাদের নিয়ে।'

আরজুর কথা শুনে একপ্রকার বিকৃত হাসি হেসে শুভ ভাই বললেন, 'এরকম কি কেউ আছে, যারা বিজ্ঞানের সান্নিধ্যে এসে আবার বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছে?'

আরজু একটু ঝেড়ে কাশল। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, এই বৃষ্টিতে চা না খেলে তো এই বৃষ্টিকে 'অপমান' করা হয়। তাই আমি উঠে প্রস্তাব দিলাম চা নিয়ে আসি? প্রস্তাব শুনে আরজু আর শুভ ভাই দুজনই সম্মতি দিলেন।

ডাকসুর বিখ্যাত ১ টাকার চা নিয়ে আসলাম, গরম চা থেকে ধোঁয়া উড়ছে, চায়ের কাপে ভাসছে লেবুর টুকরো। চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে আরজু বলা শুরু করল, 'নোমান আলী খানের নাম শুনেছেন?' নামটা আমার কাছে খুব পরিচিত লাগছে; কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না—কে তিনি। শুভ ভাইও চিনতে না পেরে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'না তো, চিনি না। কে তিনি?'

'বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় মুসলিম বক্তাদের একজন হলেন নোমান আলী খান।'

আরজুর কথা বলার মাঝখানে থামিয়ে বললাম, 'ওই যে গতরাতে The Prize of Submission to Allah যে লেকচারটি শুনেছিলাম তিনি না?' আরজু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

আবার বলা শুরু করল, 'বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় এই স্কলারও একসময় নাস্তিক ছিলেন।' আরজুর এই কথা শুনে তো আমি চমকে উঠলাম! একজন নাস্তিক হয়েও এখন তিনি পৃথিবীর হাজার হাজার মুসলিম তরুণ-তরুণীর প্রাণের স্পন্দন।

আরজু বলে চলল, 'এছাড়াও বর্তমান সময়ের আরেক বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ইউসুফ চেম্বারও একসময় নাস্তিক ছিলেন। এমনকি Islamic Online University এর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বের আরেক জনপ্রিয় মুসলিম স্কলার ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসও একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।'

আরজুকে মুসলিম স্কলারদের উদাহরণ টেনে আনতে দেখে শুভ ভাই বললেন, 'আরে বাদ দাও তো ওই সব তোমাদের বিখ্যাত মুসলিম স্কলারদের কথা। তারা বিজ্ঞান পড়েন নাই, তাই আবার মুসলিম হয়েছেন। বিজ্ঞান পড়লে এরকম হতেন না।'

আরজু এবার একটু নড়েচড়ে বসল। শুভ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আরজু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা শুভ ভাই, এন্টোনি ফ্লিউ (Antony Flew) এর *Atheistic Humanism* বইটা পড়েছেন?'

প্রশ্নটা শুনে শুভ ভাইয়ের মুখ একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কাচুমুচু করে বললেন, 'হ্যাঁ, পড়েছি, বইটাতে নাস্তিকতা আর মানবধর্মের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়।'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, তার *Darwin Evolution* আর *Evolutionary Ethics* বই দুটো পড়েছেন?'

শুভ ভাই মাথা নাড়লেন, বই দুটো তিনি পড়েননি।

আমি আরজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তিনি? যে তার এতো বই তুই পড়েছিস?'

'হ্যাঁ, সেটাই বলছি দাঁড়া। তিনি ছিলেন নাস্তিকদের আধ্যাত্মিক নেতা। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন। প্রায় সারাটা জীবন নাস্তিকতার প্রচার করেছেন। মৃত্যুর পরের জীবন, ভাগ্য বনাম স্বাধীন ইচ্ছা, আত্মা বা রূহ এসবের সমালোচনা করে তিনি প্রচুর বই, কলাম লিখেছেন। লেকচার দিয়েছেন, ডিবেট করেছেন।'

আরজু যতই বলে যাচ্ছিল শুভ ভাইয়ের মুখ ততই ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না, নাস্তিকদের সবচেয়ে বড় নেতার নাম শুনে তার মুখ ফ্যাকাসে হবার কারণ কী।

আরজুর মুখে এবার সামান্য হাসির আভা ফুটে উঠল, চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলা শুরু করল, 'কিন্তু, ২০০৪ সালে বেচারা একদম বেঁকে বসেন। এতোদিনের কাজ, বিশ্বাস আর পরিশ্রমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তার এতোদিনের সঙ্গীসাথি, শুভাকাঙ্ক্ষী মহলকে বিস্ময়ের সাগরে ভাসিয়ে এই কট্টর নাস্তিক আস্তিক হয়ে যান!'

এই কথা শোনার পর শুভ ভাইয়ের বলার মতো আর কিছু থাকল না, কেবল বললেন, 'তুমি তো সবকিছুরই ভালো খোঁজ-খবর রাখো দেখি।'

'এতোদিন রাখতাম না বলে আপনারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে যা ইচ্ছা বলেছেন। এবার যখন খোঁজ-খবর নিতে গেলাম, গিয়ে দেখি কেঁচো খুঁড়তে সাপ নয় কুমির বের হলো!'

আরজু হাসছে, তার হাসি দেখে আর তর্কে হারার পর শুভ ভাইয়ের ফ্যাকাসে মুখ দেখে আমারও হাসি পাচ্ছিল। খুব কষ্টে হাসি চেপে রাখলাম।

এতোক্ষণ শুভ ভাইয়ের ল্যাপটপ আমার কাছে ছিল। আমার কাছ থেকে ল্যাপটপটি নিয়ে Backspace এ ক্লিক করে পুরো আর্টিকেলটা কেটে ফেলেন। হয়তোবা কে আস্তিক থেকে নাস্তিক বা নাস্তিক থেকে আস্তিক হলো এরকম ধারাবাহিক ব্লগ তিনি লিখবেন না।

বৃষ্টি থামছে, আমরা উঠে দাঁড়ালাম যাওয়ার জন্য। শুভ ভাই আরজুকে বললেন, 'তোমার কাছে কি এন্টোনি ফ্লিউ এর শেষ বইটা আছে? থাকলে আমাকে দিয়ো তো।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, রাতে আপনাকে দিয়ে যাব।'

আমরা হাঁটা শুরু করলাম। আরজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন বইয়ের কথা শুভ ভাই বলছেন?'

'আস্তিক হয়ে যাবার পর এন্টোনি ফ্লিউ ২০০৭ সালে আরেকটি বিখ্যাত বই লেখেন যেটা তার অন্য বই *Does God exist?* এর জবাবে লেখা—*There is a God : How the notorious atheist changed his mind*। বইটিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যেসব প্রশ্ন করতেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদের পক্ষে যেসব যুক্তি-তর্ক আগে লিখেছেন, সেসবকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট রিফিউজ করেন।'

আমরা হাঁটছি টিএসসির দিকে। কিছুক্ষণ আগে যে-আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছিল সেই আকাশের বুক চিরে এখন রোদ উঁকি দিচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম এই সৃষ্টিজগতের মধ্যেই তো আল্লাহ কত সুন্দর নিদর্শন রেখেছেন!

চোরের হাত-কাটার বিধান কি নিষ্ঠুরতা?

অনেকদিন ধরে রুমে রান্না করা হয় না। হলের ক্যান্টিনগুলোতে খাবারের যা অবস্থা, প্রথম প্রথম তো একেবারে খেতেই পারতাম না। এখন যে পারি—তাও না। বলা যায় বাধ্য হয়েই খেতে হয়। ক্লাস, টিউশনি তারপর আবার পড়ালেখা করে রান্না করার সময়ই পাই না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আকাশ খানিক মেঘাচ্ছন্ন। তানভীর ভাই বসে বসে পেপার পড়ছেন আর আরজু পড়ছে মোহাম্মদ আসাদের *The Road To Mecca.* বইটা পড়ার জন্য আমি তাকে সাজেস্ট করি। লেখক তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাকে অনেক সুন্দর একটা উপমা দেন Home coming of the heart—স্বদেশে, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

ফ্রেশ হয়ে এসে তানভীর ভাইকে বললাম, 'ভাই, আজ মেঘলা দিন। খিচুড়ি খাওয়া যায়।'

পত্রিকা থেকে চোখ তুলে তানভীর ভাই বললেন, 'পত্রিকার রান্না পাতায় খিচুড়ির ছবি দেখে আমারও মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, তুমি ঘুম থেকে ওঠো, তোমাকে বলব।'

আরজুও বই থেকে চোখ তুলে বলল, 'আজকাল তো দেখি তানভীর ভাইয়ের টেলিপ্যাথি বেশ কাজ করছে। হা হা হা হা হা...'

খিচুড়ি রান্নার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে কাজ ভাগ করে দেওয়া হলো। আরজুর কাজ বাজার করে আনা, তানভীর ভাইয়ের কাজ রান্না করা, আর আমার কাজ ধোয়া-মোছাসহ যাবতীয় এরেঞ্জমেন্ট করা।

আরজু বাজার আনতে বের হচ্ছে। পলাশী বাজারে যাবে। বললাম, 'ছাতা নিয়ে যা, বৃষ্টি আসবে তো।' ছাতা নিলেও ছাতার প্রয়োজন হয়নি। বৃষ্টি শুরু হবার আগেই বাজার নিয়ে ফিরল। মুরগির গোশত, ডাল, সবজি আর চাল নিয়ে যখন হলে ফিরল, ঠিক তখন বৃষ্টি নামা শুরু হলো।

আমি আর তানভীর ভাই আমাদের কাজে লেগে গেলাম। আরজু আবারও *The Road To Mecca* বইটা পড়া শুরু করল।

গোশত আর সবজি কাটাকুটি করে তানভীর ভাই রান্না বসালেন। পাশে বসে আমি গল্প করছি। তানভীর ভাই বললেন, 'সকালে ঘুম থেকে উঠে পত্রিকা পড়তে গেলেই মন খারাপ হয়ে যায়। যদি একটা ভালো সংবাদ থাকে তাহলে দশটা খারাপ সংবাদ থাকে। ধর্ষণ, খুনাখুনির খবর ছাড়া মনে হয় এখনকার পত্রিকাগুলো অপূর্ণাঙ্গ।'

আফসোসের সুরে তানভীর ভাই বলেই চললেন, 'এই দেখো, পানির মেশিন চুরির অভিযোগে একটা ছেলেকে গাছে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অথচ সে যে চুরি করেছে, এটা প্রমাণিত নয়।'

তানভীর ভাইয়ের হাত থেকে পত্রিকা নিয়ে ঘটনাটা পড়তে লাগলাম।

'ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার চর শ্রীরামপুর গ্রামে চুরির অভিযোগে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এরপর লাশ একটি বাড়িতে ফেলে হত্যাকারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনার প্রায় ৩০ ঘণ্টা পরে আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় পুলিশ ওই বাড়ির সামনের একটি কাশবন থেকে ওই কিশোরের লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, নিহত কিশোরের নাম মো. সাগর (১৬)। সাগরের বাবার দাবি, সাগর চুরি করতে পারে না।'[১]

আমাদের দেশে কী অমানবিকভাবেই না চুরের শাস্তি দেওয়া হয়!

রান্না প্রায় হয়ে এলো। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এরকম বৃষ্টিকে ইংরেজিতে Cats and dogs বলে। কয়েকদিন আগে জানলাম, এরকম বৃষ্টিকে কেন 'বিড়াল কুকুরের বৃষ্টি' বলা হয়।

---

[১] *দৈনিক প্রথম আলো*, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১৭

এটা এসেছে গ্রিক 'cata doxa' থেকে; যার মানে হলো 'contrary to experience or belief.' যখন অবিশ্বাস্য রকমের বৃষ্টি হয়, এই এক্সপ্রেশন বোঝাতে এই প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। এই বৃষ্টির মধ্যে আবার কে এলো? দরজা খুলে দেখলাম নিলয় হাতে একটা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছেলেকে হাতে বই ছাড়া খুব কম সময়ই দেখেছি। আমাদের এক ব্যাচ জুনিয়র, পাশের রুমে থাকে। বই পড়ার জন্য আরজুর সাথে তার বেশ সখ্য।

আরজুর কাছে এসেছে। বইটা আরজুর বইয়ের সেলফে রেখে বলল, 'ভাই বইটা ফেরত দিলাম।'

বই থেকে চোখ না তুলে আরজু জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল?'

নিলয় মাথা নেড়ে বলল, 'সাক্ষাৎকারগুলো বেশ ভালো লেগেছে।'

আরজু প্রতিউত্তরে আর কিছু বলছে না। নিলয় এভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর বই থেকে চোখ তুলে আরজু জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

নিলয় এবার আশ্বাস পেল। 'হ্যাঁ, ভাই।'

'হুম, বলো।'

'আচ্ছা, আপনার কাছে কি মনে হয়, এই আধুনিক যুগে এসে একজন চোরের চুরির অপরাধে তার হাতকাটা এটা বর্বরতা না?'

সেলফে রাখা বইটার দিকে তাকিয়ে আরজু জিজ্ঞেস করল, 'এরকমটা কখন থেকে মনে হচ্ছে? বইটা পড়ার আগ থেকে নাকি পড়ার পর থেকে?'

'পর থেকে।'

বইয়ে কী লেখা আছে দেখার জন্য হাতে নিলাম। হুমায়ূন আহমেদের বারোটি সাক্ষাৎকার নিয়ে হাসান হাফিজের সম্পাদিত বই *এক ডজন হুমায়ূন*। আরজু আমার হাত থেকে বইটি নিয়ে ওই সাক্ষাৎকারটি দেখিয়ে দিল।

সবুজ রঙের হাইলাইটার দিয়ে আরজু লেখাটি দাগিয়ে রেখেছে। লেখাটি পড়া শুরু করলাম—

‘ধর্মের অনেক বিধান এখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, সেই সময়ে যেটা ঠিক ছিল এই সময়ে সেটা ঠিক নয়। যেমন, চুরি করলে হাতটা কেটে দেওয়া। সেটা হয়তো সেই সময়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আমি মনে করি না, এই সময়ের জন্য সেটা ঠিক আছে।’[১]

লেখক এগুলো কী বলছেন? আল্লাহর বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন?

গতরাতে কুরআনের একটি আয়াতের অনুবাদ পড়েছিলাম, যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারী উক্ত বিষয়ের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।[২]

তাহলে লেখক এখানে কী বোঝাতে চাচ্ছেন? এসব চিন্তা যখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তখন আরজু বলা শুরু করল,

ইসলামের বিধানগুলোর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো, ইসলাম কেবল শাস্তির বিধান আরোপ করেই অপরাধ কমানোর সমাধান দেয়নি; বরং মানুষ যাতে অপরাধ না করে সেই ব্যবস্থাও কার্যকর করেছে। LBW (Love Before Wedding) কে ইসলাম অনুমোদন দেয়নি, এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। একই সাথে LBW আউট না হবার জন্য ইসলাম বিয়ে করাকে উৎসাহিত করেছে, বিয়ে করার একান্ত সামর্থ্য না থাকলে রোযা রাখার কথা বলেছে।

ইসলাম অর্থনৈতিক সমস্যারও একটা সমাধান দিয়েছে। ইসলামের মূল পিলারের একটি হলো যাকাত। ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে, ধনীদের সম্পত্তিতে গরীবের অংশ রয়েছে। দান-সাদকা করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। এমনকি যে নিজের টাকা দিয়ে নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী উপোস থাকে, তাকে ভৎর্সনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—সে মুমিন নয়![৩]

---

[১] *এক ডজন হুমায়ূন আহমেদ*, পৃষ্ঠা ৪১

[২] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬

[৩] *আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ, হাদীস নাম্বার ১১১

নিলয়ের পাশাপাশি আমিও মনোযোগী শ্রোতার মতো আরজুর কথাগুলো শুনে যাচ্ছি। আরজু বলে চলছে, মানুষ যাতে চুরি না করে এর সমস্ত ব্যবস্থা ইসলাম সম্পন্ন করেছে। তারপরও যদি কেউ চুরি করে তাহলে তার শাস্তির বিধান সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

যে-পুরুষ চুরি করে এবং যে-নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।[১]

নিলয় বলল, 'বুঝলাম ভাই, চুরি করলে হাত কাটা হবে; কিন্তু সামান্য চুরির জন্য একজন মানুষের হাতকাটা হবে। এটা অমানবিক না?'

'দেখো নিলয়, চুরির শাস্তি হাত কাটা। এই বিধানের সূচনা ইসলাম করেছে এমন না। ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াতেও এই বিধান কার্যকর ছিল।'[২]

তবে ইসলাম যেটা করেছে সেটা হলো শর্তারোপ। কতটুকু সম্পদ চুরি করলে হাতকাটা হবে সেই শর্ত ইসলাম জুড়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ চুরি করলে হাত কাটা যাবে।[৩] এর চেয়ে কম হলে হাত কাটা যাবে না।[৪]

আমি জানতে চাইলাম, 'এক দিনার সমান বর্তমান হিসাবের কত টাকার সম্পদ?'

এক দিনার = ৪.২৫ গ্রাম সোনা। আর এক দিনারের এক চতুর্থাংশ = ১.০৬২৫ গ্রাম সোনা। আজকের বাজারদর অনুযায়ী বাংলাদেশে ১ গ্রাম সোনার দাম ৩২১২ টাকা ১৪ পয়সা। অর্থাৎ, কেউ এর থেকে বেশি মূল্যমানের কিছু চুরি করে তবে সে এই হাত-কাটার বিধানের আওতার মধ্যে পড়বে।

---

[১] সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ৩৮

[২] *তাফসীর ইবনে কাসীর*, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬০

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৬৭৯০

[৪] *সহীহ মুসলিম* : ৪২৯৩

নিলয় জিজ্ঞেস করল, ‘তার মানে কেউ ৩২১২ টাকার বেশি মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলেই তার হাত কাটতে হবে?’

‘না। তার আগে প্রমাণ করতে হবে সে চুরি করেছে। সন্দেহবশত কাউকে চোর মনে করে হাত কাটাকে ইসলাম সমর্থন করে না। এজন্য অবশ্যই দুইজন ন্যায়পরায়ণ স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষী দিতে হবে যে, ওই ব্যক্তি চুরি করেছে, অথবা চোর নিজে তার স্বীকারোক্তি করবে।’[১]

এবার নিলয় তার মূল প্রশ্নটা আবারও করল, ‘আচ্ছা আরজু ভাই, এই আইনটা কি এখনকার সময়ের জন্যও প্রযোজ্য?’

আরজু হাসল।

‘নিলয়, তুমি তো জানো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় থাকাবস্থায় কী পরিমাণ অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছে? তাকে হত্যা করার প্ল্যান করা হয়েছে। মদীনায় যাবার পর মুসলিমবাহিনীর সাথে মক্কাবাসীর বদর-উহুদের মতো বড় বড় যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ করার উদ্দেশ্যে গেলে তাকে মক্কায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তুমি তো নিশ্চয় এগুলো জানো।’

নিলয় মাথা নেড়ে বলল, ‘হ্যাঁ ভাই, জানি।’

‘কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছিলেন?’

নিলয় উত্তরে বলল, ‘সবাইকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে কাবাঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজ ঘরে প্রবেশ করে দরজার কপাট লাগিয়ে দেবে সে নিরাপদ।’

‘হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলছ। তবে অপূর্ব ক্ষমার এই দিনে মক্কার কুরাইশ বংশের মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করে। তার বংশ-মর্যাদার কথা চিন্তা করে কুরাইশ বংশের লোকেরা উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চোরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশ করতে বলে। উসামা ইবনে যায়েদ

---

[১] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ,* চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫

রাযিয়াল্লাহু আনহু সুপারিশ করতে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?

তারপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—হে মানবগণ, নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ, কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যখন চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার ওপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দেবে।[১] তারপর সেই মহিলার হাত কাটা হয়।'[২]

ঘটনাটি এর আগেও একবার শুনেছিলাম। আমি বললাম, নিলয় তোমাদের Law-তে একটা নীতিবাক্য আছে না, 'Everyone is equal before the law?'

নিলয় 'হ্যাঁ সূচক' মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, 'ইসলাম এই ধরনের নীতিবাক্য কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দেন, তার নিজের মেয়ে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাও যদি চুরি করে তবে তারও হাত কাটা হবে। নেপোটিজমের কোনো স্থান নাই ইসলামে।'

আরজু বলে চলল, 'বাংলাদেশে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে চোরের সাথে কেমন আচরণ করা হয়? রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে এরকম ঘটনা হর-হামেশা দেখা যায়, চোরকে মেরে তক্তা বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় কিংবা জেলে দেওয়া হয়। শুধু যে আধমরা করে ছেড়ে দেওয়া হয়—এমনও না; অনেক ক্ষেত্রে চুরির অভিযোগে চোরকে হত্যা করাও হয়।'

'চোরকে হত্যা করা হয়' কথাটা শুনে নিলয়ের চোখ কপালে উঠল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হত্যা করা হয়!'

তানভীর ভাই এতোক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি আজকের পত্রিকা এনে নিলয়কে দেখালেন, এই দেখো আজকের পত্রিকায় এরকম একটা সংবাদ

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৭৮৮

[২] *সহীহ বুখারী* : ২৬৪৮

ছেপেছে। পানির মেশিন চুরির অভিযোগে কোনো প্রমাণ ছাড়াই ষোলো বছরের এক ছেলেকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

নিলয় পত্রিকার সংবাদটা পড়ছে। আরজু তার ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করল। এটার মধ্যে সে পেপার কাট জমিয়ে রাখে।

কয়েকটা পেপারকাট নিলয়কে দেখাল। নিলয়ের পড়া শেষে আমিও পড়া শুরু করলাম—

পাবনা শহরে সাইকেল চুরির অভিযোগে তুলসী চন্দ্র দাস নামের ২৫ বছর বয়সী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।[১]

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় গোরু চুরির অভিযোগে দুজন চোরকে পিটিয়ে হত্যা করে গ্রামবাসী।[২]

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার খনকুট গ্রামে মোবাইল চুরির অভিযোগে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারা হয়![৩]

আমাদের পড়া শেষ হলে আরজু বলল, 'এগুলো তো বলা যায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমাদের দেশের আইনে তো আর বলা নাই যে, চোরকে পিটিয়ে হত্যা করো। কিন্তু আজ থেকে ৫২০০ বছর আগে সুমেরীয় সভ্যতায় চুরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায়ও একই শাস্তি প্রযোজ্য ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গণতন্ত্রের সূতিকাগার খ্যাত প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা—এমনকি হোলি রোমান এম্পায়ারেও চুরির শাস্তির বিধান ছিল মৃত্যুদণ্ড।'

নিলয়ের আর বুঝতে বাকি নেই, ইসলামে চোরের শাস্তি হাতকাটা এটা সে যেরকম বর্বরতা, অমানবিক মনে করেছে আসলে এটা ওরকম নয়।

পাশ থেকে তানভীর ভাই বলে উঠলেন, 'প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে চুরির শাস্তি ছিল মৃতুদণ্ড, জাহেলিয়াতের সময় চুরির শাস্তি ছিল শর্তহীনভাবে হাতকাটা, বাংলাদেশে

---

[১] এনটিভি অনলাইন, ১ আগস্ট ২০১৫

[২]দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩

[৩]দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ২৮ অক্টোবর ২০১৭

বর্তমানে চুরির বাস্তবিক শাস্তি হলো চোরকে পিটিয়ে আধমরা করা বা কখনও কখনও হত্যা করা। এগুলোকে কারও কাছে 'বর্বরতা' মনে হচ্ছে না!

ইসলাম চুরি না করার অর্থনৈতিক সমাধান দেবার পর কেউ যদি চুরি করে তাহলে কতটুকু সম্পদ চুরি করলে সাক্ষী-প্রমাণসহ হাত কাটা হবে সেই শর্তজুড়ে দেবার পর বলেছে, হাত কেটে ফেলো।

কিন্তু ইসলাম কেন হাত কাটার কথা বলল? এটাই সমস্যা। ইসলামে চুরির শাস্তির বিধান হাত কাটা না হয়ে যদি হতো, যে চুরি করে তাকে একটা ললিপপ খাওয়াও তারপরও আমাদের সুশীলরা বলে উঠত, ইসলাম তো বর্বর ধর্ম, চোরকে পাঁচ টাকা দামের ললিপপ খাওয়ায়। চোরকে উচিত ডেইরি মিল্ক, কিটকাট অথবা স্নিকার্স খাওয়ানো!'

তানভীর ভাইয়ের কথা শুনে সবাই সমস্বরে হেসে উঠলাম। আড্ডা শেষে নিলয় উঠে যেতে চাইলে আরজু বলল, 'বসো, আজ আমরা খিচুড়ি রান্না করেছি, খিচুড়ি খেয়ে যাও।'

প্লেটগুলো ধুয়ে আনলাম। মেঝেতে পেপার বিছিয়ে সবাই খেতে বসেছি। খিচুড়ির ওপর থেকে গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাইরে 'বিড়াল কুকুরের বৃষ্টি' হচ্ছে।

নতুন মোড়কে পৌত্তলিক সংস্কৃতি

'Black Nazarene সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণা আছে?' একদিন ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন ক্লাসে হামিদুল্লাহ স্যার আমাদেরকে প্রশ্নটি করেন। ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন কোর্সটা আমাদের নন-মেজর কোর্স, কলা ভবনে গিয়ে আমি আর আরজু ক্লাস করি।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ কোনো রেস্পন্স করছে না। সবাইকে চুপটি মেরে বসে থাকতে দেখে হামিদুল্লাহ স্যার নিজেই উত্তর দেওয়া শুরু করেন।

'ব্ল্যাক নাজারিন বা কৃষ্ণাঙ্গ যিশু হলো যিশু খ্রিস্টের একটা কালো মূর্তি। ফিলিপাইনের ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা প্রতি বছর ৯ জানুয়ারি যিশুর কালো মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ক্যাথলিকরা খালি পায়ে যায় এবং তারা বিশ্বাস করে, যারা এই মূর্তিটি ছুঁতে পারবে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। এতো এতো মানুষ তো আর মূর্তিটি ছুঁতে পারবে না, এজন্য সাদা তোয়ালে দিয়ে কালো মূর্তিটি মুছে তোয়ালেটি ভক্তদের দিকে ছুড়ে দেওয়া হয়।'

একটা কাঠের মূর্তি ছুঁলে মানুষ আর অসুস্থ হবে না, এরকম অদ্ভুত বিশ্বাস মানুষ কীভাবে করে? বিশ্বধর্ম কোর্সটি পড়তে গিয়ে এরকম বেশকিছু 'অদ্ভুত' বিশ্বাসের কাহিনী পড়ে বিষম খেয়েছি। ব্ল্যাক নাজারিনের কাহিনী শুনে যেইমাত্র ভাবনার সাগরে ডুব দিতে যাবো তখন ভাবান্তর ঘটে অপুর প্রশ্নে।

আচ্ছা স্যার, 'এরকম অদ্ভুত শোভাযাত্রায় কি আদৌ মানুষ অংশগ্রহণ করে?'

হামিদুল্লাহ স্যার হেসে বলেছিলেন, 'অংশগ্রহণ করে মানে? কমপক্ষে ৮ লক্ষ মানুষ এই মঙ্গাল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। আর এই শোভাযাত্রাটি চলে ২০ ঘণ্টাব্যাপী।'[১]

ব্ল্যাক নাজারিন সম্পর্কে স্রেফ এতোটুকু বলার পর হামিদুল্লাহ স্যার আমাদেরকে একটা এসাইনমেন্ট দেন। এসাইনমেন্টের টপিক— পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে শোভাযাত্রা। দুজন করে একটা এসাইনমেন্ট গ্রুপ। আমার এসাইনমেন্ট-মেট আরজু।

সকালে নাশতা করে এসে দেখি আরজু টেবিলের সামনে ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে। ছুটির দিনে ভাবলাম এসাইনমেন্টটা করে নিই। আরজু আমার হাতে একটা পেপার-কাট দিয়ে বলল, 'আগে এটা পড়।'

পেপার-কাট হাতে নিয়ে দেখলাম আনন্দবাজার পত্রিকার একটা নিউজের অনলাইন-প্রিন্ট। নিউজের শিরোনাম—'ঢাকার পয়লা বৈশাখ যেন অষ্টমীর একডালিয়া'। আগ্রহ নিয়ে নিউজটা পড়া শুরু করলাম।

'কার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে! কখনও মনে হচ্ছিল কলকাতার কলেজ স্কোয়ার বা একডালিয়ার পুজো মণ্ডপ। কখনও বা শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের চেহারা। তা সে রমনার বটমূলের বৃন্দগানই হোক কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাজপথে মঙ্গাল শোভাযাত্রা। পুজো, বসন্ত উৎসবের মিলমিশে একাকার ঢাকার নববর্ষের সকাল। শুধু পুজো নয়, কলকাতার সরস্বতী পুজো, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মেজাজও যেন ধরা পড়ল বাংলাদেশের এই নববর্ষে! জাতি-ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে এ যেন সর্বজনীন উৎসব।'[২]

নিউজটা পড়ে বেশ অবাক হলাম। যেই উৎসবকে আনন্দবাজার পত্রিকা তুলনা করছে পুজোর সাথে, সেই উৎসবকে এদেশের সেক্যুলাররা বলে 'এটা কোনো হিন্দুয়ানী উৎসব না, এটা বাঙালির সংস্কৃতি'।

গতবছর তো এই নিয়ে আরজুর সাথে রণকের ছোটখাটো একটা বিতর্ক হয়ে যায়। পহেলা বৈশাখের দিন আমরা মঙ্গাল শোভাযাত্রায় যাচ্ছি না বলে রণক বলেছিল, 'হাজার

---

[১] Hundreds of thousands join annual Catholic procession in Manela/ ALJAZEERA (Link: http://bit.do/eNyfo)

[২] ঢাকার পয়লা যেন অষ্টমীর একডালিয়া/ আনন্দবাজার পত্রিকা (লিংকঃ http://bit.do/eNyfW)

বছরের বাঙালি সংস্কৃতি উদযাপন না করে রুমে বসে বই পড়ার কোনো মানে হয়?'

আরজু অট্টহাসি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি? তো মশাই, আপনার নিশ্চয় জানা আছে বাংলা সনের প্রবর্তন কত সালে হয়?'

'জানা থাকবে না কেন? ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।'

'আজ থেকে কত বছর আগে?'

মনে মনে হিসেব করতে সময় লাগছিল দেখে আমি তখন মোবাইলের ক্যালকুলেটর বের করে হিসেব করে বললাম (২০১৯-১৫৮৪) ৪৩৫ বছর।

'বাংলা সনের উৎপত্তি যেখানে আজ থেকে ৪৩৫ বছর আগে, সেখানে পহেলা বৈশাখের দিন মঙ্গাল শোভাযাত্রা আর পান্তা-ইলিশ খাওয়া কীভাবে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি হয়?'

আরজুর প্রশ্ন শুনে রণক ছিল নিরুত্তর। সুযোগ পেয়ে তখন আমি বললাম, 'তখনকার সময়ে তো হিসেবের বই আপডেট দেবার জন্য ব্যাবসায়ীরা নতুন-পুরাতন কাস্টমারদেরকে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাদেরকে মিষ্টি খাওয়াতেন। আর কৃষকরা পহেলা বৈশাখের আগের দিন জমির মালিকের খাজনা পরিশোধ করত, জমির মালিকেরা পরদিন কৃষকদের মিষ্টিমুখ করাতেন। এখনকার সময়ে যেভাবে নববর্ষ উদযাপন করা হয়, তখনকার সময়ে তো এমন ছিল না।'

সেদিন রণক উদারমনে মেনে নিয়েছিল, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি বলতে সে যা জানত সেটা একটা মিথ। তবে আরজু এটাকে মিথ না বলে প্রোপ্যাগান্ডা বলার পক্ষে। ওই দিন আমরা বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেছিলাম, স্বৈরাচার এরশাদের পতনের প্রত্যয়ে চারুকলার শিক্ষার্থীরা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে (১৯৮৯) যে আনন্দ শোভাযাত্রাটি করেছিল সেটি যেভাবে মঙ্গাল শোভাযাত্রা হয়ে ওঠে। আর ত্রিশ বছর আগের সংস্কৃতিকে হাজার বছরের সংস্কৃতি বলার মতলবটাই বা কী!

আনন্দবাজার পত্রিকার নিউজ-কাটটি আরজুর হাতে দিয়ে বললাম, 'এমনকি হিন্দুরাও বলছে এটা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, অথচ আমাদের দেশের নামধারী মুসলমানরা বলে, এটা বাঙালি সংস্কৃতি। হাও রিডিকুলাস!'

'মজার ব্যাপার হলো, হিন্দুদের এই দাবির পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে।'

'তুই বলতে চাচ্ছিস যে, পহেলা বৈশাখের সংস্কৃতি হিন্দুদের সংস্কৃতি- এটা শুধু কথার কথা না, এর ভিত্তিও আছে?' খানিকটা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই এর ভিত্তি আছে। মঙ্গাল শোভাযাত্রায় প্যাঁচার মুখোশ দেখছিস না?'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। 'হ্যাঁ, প্যাঁচার মুখোশ ছাড়া কি আর মঙ্গাল শোভাযাত্রা হয়?'

'এই প্যাঁচা হলো হিন্দু দেবি লক্ষ্মীর বাহন। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে লক্ষ্মী হলো ধন, সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবি।[১] দেবি লক্ষ্মী আর প্যাঁচা...'

আরজুকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'এজন্যই বলা হয় লক্ষ্মীপ্যাঁচা?'

'হা-হা-হা। তাছাড়া মঙ্গাল শোভাযাত্রার সময় দেখবি হাতির প্রতিকৃতি নিয়ে মানুষজন যাত্রা করছে। এই হাতির মাথা হলো হিন্দুদের সবচেয়ে পূজিত দেবতা গণেশের মাথা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, গণেশের পূজা করলে সব বাধা ও অশুভ প্রভাব কেটে যায়। এজন্য গণেশ মূর্তিকে (হাতির মুখায়ব) সাফল্য ও সমৃদ্ধির বাহক মঙ্গালমূর্তি বলা হয়।'[২]

মঙ্গাল শোভাযাত্রায় যেসব মুখোশ, প্রতিকৃতি নিয়ে যাওয়া হয়, আরজু একে একে সবগুলোর 'ফজিলত' বর্ণনা করল। এই যেমন, মঙ্গাল শোভাযাত্রায় রাজহাঁস নিয়ে যাওয়া হয়। এই রাজহাঁস হলো হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী বিদ্যার দেবি স্বরসতীর বাহন[৩]। বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের যে প্রতিকৃতি নিয়ে যাত্রা করা হয়, এই ষাঁড় হলো হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী শিবের বাহন[৪]।

কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা কেন ঢাকার মঙ্গাল শোভাযাত্রাকে অষ্টমীর পূজার সাথে তুলনা করছে, সেটা বুঝতে আমার আর বাকি রইল না। মঙ্গাল শোভাযাত্রার প্রতিকৃতি আর মুখোশগুলোর আড়ালে যে হিন্দু পুরাণের সৌভাগ্যের দেব-দেবিদের

---

[১] লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা কেন জানেন? আনন্দবাজার পত্রিকা (http://bit.do/eNygp)

[২] সাফল্য ও সমৃদ্ধির বাহক মঙ্গালমূর্তি শ্রী গণেশ/ এই সময় (http://bit.do/eNyg5)

[৩]দেবি সরস্বতীর কাহিনী/ বাংলা ট্রিবিউন (http://bit.do/eNyhp)

[৪] শিবকে চিনেন, কিন্তু তার বাহন নন্দীর মাহাত্ম্য কি জানেন/ এ বেলা (http://bit.do/eNyhB)

বাহনের প্রতিচ্ছবি আছে সেটা যতই আমাদের দেশের সেক্যুলাররা অস্বীকার করুক না কেন, হিন্দুরা কিন্তু ঠিকই চিনে নিচ্ছে।

আরজু আফসোসের সুরে বলল, 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ' প্রবাদ বাক্যটির মতো হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিগুলোকে বাঙালি সংস্কৃতির মোড়কে মুড়িয়ে ব্র্যান্ড লাগানো হচ্ছে 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি!'

হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম সকাল ৯.১৭ বাজে। আরজুকে বললাম, 'হামিদুল্লাহ স্যারের 'Black Nazarene' এর এসাইনমেন্টটা আগে করে নিই, তারপর না হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার ময়নাতদন্ত করব?'

'হ্যাঁ, এটাই ভালো হয়। যা-ই মঙ্গল শোভাযাত্রা, তা-ই ব্ল্যাক নাজারাইন!'

তোমরা তা কখনই পারবে না...

মোবাইলের রিংটোন অনর্গল বেজে যাচ্ছে। আরজুর ঘুম ভাঙল। মোবাইল হাতে নিয়ে দেখল স্ক্রিনে উঠে আছে ৬টা মিসড কল। কলগুলো দিয়েছেন তার ফুফু রাশেদা বেগম। রাশেদা বেগম থাকেন ধানমণ্ডিতে, ঢাকায় থাকা আরজুর একমাত্র আত্মীয়। যদিও আরজু ভার্সিটিতে আসার পর থেকে মোটে দুই-তিনবার ধানমণ্ডিতে তার বাসায় গিয়েছে।

কোনো বিশেষ দরকারে হয়তো ফুফু ফোন করেছেন, তাই দেরি না করে আরজু কল ব্যাক করল। ওপাশ থেকে রাশেদা বেগম তাড়াহুড়োর ভঙ্গিতে বললেন, 'তুই তাড়াতাড়ি আমার বাসায় আয়।' রাশেদা বেগমের এরকম তাড়াহুড়োর সাথে আরজু ছোটবেলা থেকেই বেশ পরিচিত। হয়তো গিয়ে দেখবে সামান্য একটা ব্যাপারকে তিনি অনেক বড় করে ফেলেছেন!

ফ্রেশ হয়ে হালকা নাশতা খেয়ে ধানমণ্ডির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল আরজু। রাস্তায় তেমন জ্যাম ছিল না, তাই আধঘণ্টার মধ্যেই ফুফুর বাসায় পৌঁছে গেল।

বিশাল আলিশান বাড়ি, বাড়ির সৌন্দর্যবৃদ্ধির বেশিরভাগ উপকরণই বিদেশ থেকে আনা। বাড়ির সামনে টবে কয়েকটা ফুল গাছ আছে। কোন গাছের কী নাম—সেটা টবে লেখা আছে।

কলিংবেলে টিপ দেবার সাথে সাথেই দরজা খুলে দেন রাশেদা বেগম। আরজুকে আদর-আপ্যায়ন করার পর রাশেদা বেগম বললেন, তোর ক্যাম্পাস থেকে এতো কাছে আমার বাসা তবুও আসিস না তুই।'

আরজু পাল্টা প্রশ্ন করল, আমাদের ক্যাম্পাসেও তো ছুটির দিনে কত মানুষ বেড়াতে যায়, তোমরা তো যাও না!' রাশেদা ফুফু এবার নিজের ব্যস্ততার অজুহাত দেখালেন, BWW-Busy Without Work.

রাশেদা ফুফু বললেন, 'এবার আসল কথায় আসি। গতরাতে আমি কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম, তখন তোর ফুফা এসে বললেন, 'এই বই শুধু শুধু পড়ে কী হবে?' আমি বললাম, এটা আল্লাহর কালাম। এর প্রত্যেকটা হরফ তেলাওয়াতের মধ্যে সওয়াব আছে।'

আমার কথা শুনে তোর ফুফা হেসে বললেন, এটা তো মানুষের রচিত গ্রন্থ, তোমরা যাকে প্রফেট বলো, সেই প্রফেট মুহাম্মাদের রচিত গ্রন্থ!'

আরজু আগ্রহ নিয়ে ফুফুর কথা শুনছিল। রাশেদা বেগম বলে চলছেন, 'আমি আমার সাধ্যমতো তোর ফুফাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এটা আল্লাহর ওহি, কিন্তু সে কী-সব হাবিজাবি উদাহরণ দেওয়া শুরু করল। শেষে তাকে বললাম, যা-ই-হোক, কাল আরজুকে আসতে বলি তার সাথেই তর্ক করো। পরে তোর ফুফা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ' আরজুকে আসতে বলো, অনেকদিন ধরে তাকেও দেখি না।'

আরজুর ফুফা রায়হান শিকদার উচ্চশিক্ষিত, আমেরিকায় গিয়ে পিএইচডি করার সময় তিনি ধর্ম-কর্ম বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নাস্তিক হিসেবে পরিচয় দেওয়া শুরু করেন। ফুফুর কথা শেষ হলে আরজু বলল, 'এটা তো একটা সিম্পল কেস, ইসলামের সমালোচকদের তো এটা কমন প্রশ্ন। যা-ই-হোক, ফুফার সাথে দেখা হলে কথ বলব এ নিয়ে।'

রায়হান শিকদার আরজুকে দেখে খুশি হয়ে বলেন, 'কী আরজু! ঢাকায় যে তোমার একজন ফুফু আছেন—সেটা তোমার মনে আছে? কোনো আসা-যাওয়া নাই!'

'জি ফুফা, ক্লাস যেদিন থাকে ওই সব দিনে ক্লাস শেষে কোথাও বের হতে ইচ্ছে হয় না আর ছুটির দিনে একটু বাড়তি ঘুমিয়ে নিই।' কথোপকথনের মাঝখানে পাশের মসজিদে আযানের সুর ভেসে এলো। নামাজে যাবার জন্য তৈরি হয়ে মসজিদের দিকে হাঁটা শুরু করল আরজু।

নামাজ শেষে সবাই একসাথে লাঞ্চ করল। লাঞ্চ করার পর রায়হান শিকদার তার রুমে আরজুকে ডেকে বললেন, বলো! 'তোমার ফুফুর কথার পক্ষে তোমার কী আর্গুমেন্ট?'

‘ফুফা আপনি অনার্স-মাস্টার্স কোন বিষয় নিয়ে করছেন?’

‘হিস্ট্রি নিয়ে।’

‘তাহলে তো ভালোই হলো। ঐতিহাসিক তথ্য থেকেই এটা প্রমাণ করি যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। আচ্ছা ফুফা, আপনি কি জানেন যে, আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ করেছেন, তারা যদি প্রমাণ করতে চায় যে, কুরআন আল্লাহর বাণী নয় তবে তারা যেন কুরআনের মতো আরেকটি গ্রন্থ রচনা করে দেখায়?’

রায়হান শিকদার মাথা নেড়ে বলেন, ‘না, আমি কুরআন পড়িনি। সো, এরকম চ্যালেঞ্জের কথা জানি না।’

‘নো প্রবলেম, ফুফা, আমি রেফারেন্স দিচ্ছি, আপনি চাইলে চেক করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ প্রথমে অবিশ্বাসীদের কুরআনের মতো একটি বাণী রচনা করতে বলেন।[১] তারপর চ্যালেঞ্জটা কমিয়ে দিয়ে বলেন মাত্র ১০ টি সূরা রচনা করতে।[২] আর প্রয়োজনে আল্লাহ ব্যতীত যারা আছে তাদের সাহায্য নিতে। তারপরও যখন তারা চ্যালেঞ্জ পূরণে ব্যর্থ হলো তখন আল্লাহ চ্যালেঞ্জটা আরও কমিয়ে বলেন, মাত্র একটি সূরা রচনা করতে।’[৩]

‘তাতে কী প্রমাণিত হলো?’

‘আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যখন কুরআন নাযিল হয় তখন আরবরা ছিল সাহিত্যের বিচারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। কবিতা ছিল তাদের নিজেদের আবেগ, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ এমনকি অশ্লীল যৌনতা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। কাবাঘরে তারা তখনকার সময়ের সাতটি সেরা কবিতা ঝুলিয়ে রাখে। যেগুলোকে মুআল্লাকা বলা হতো। আরবের সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্র উকায এবং মুজান্নায় অনুষ্ঠিত হতো কবিতা উৎসব। প্রত্যেক গোত্রের একজন প্রতিভাবান কবি সেই কবিতা উৎসবে অংশগ্রহণ করত নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে। আরবদের এই কবিতাপ্রীতি নিশ্চয়ই আপনি জানেন?’

‘হ্যাঁ, জানি।’

---

[১] সূরা তূর, আয়াত : ৩৪

[২] সূরা হুদ, আয়াত : ১৩

[৩]সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩৮, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩-২৪

'তখনকার দিনে আরবে এতো উৎকৃষ্ট মানের কবি সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও কেউ ন্যূনতম একটা সূরা রচনা করে কুরআনের চ্যালেঞ্জকে ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকি তখনকার আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, যাকে বলা যায় তখনকার সময়ের 'আরবের শেক্সপিয়ার'। সেই ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা কুরআনকে টেস্ট করতে যান।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তেলাওয়াত শোনার পর ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা কাফির নেতাদের কাছে গিয়ে বলেন, 'আমি কী বলব? তোমাদের মধ্যে কেউই কাব্য এতো ভালো জানো না, যেভাবে আমি জানি। আরবীভাষা গঠন আর অলংকার সম্পর্কেও তোমাদের মধ্যে কেউ আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। তারপরও আমি বলছি, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের কথার সাথে আমি যা জানি তার কোনোকিছুরই সাদৃশ্য নেই। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে যা বলছে তা খুবই মাধুর্যপূর্ণ।'

'তার মানে, তুমি বলতে চাও, কুরআনের মতো এমন গ্রন্থ রচনা করে এখনও কেউ এর চ্যালেঞ্জ এক্সেপ্ট করেনি?'

আরজু হেসে বলল, 'এটা আমার মুখের কথা না, ঐতিহাসিক সত্যও বটে। এরকম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবার পর থেকে এখনও পর্যন্ত অনেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে এরকম একটি সূরা রচনার জন্য; কিন্তু কেউই সফল হতে পারেনি। তখনকার সময়ে অনেক আরব ইহুদী-খ্রিস্টান ছিল। এমনকি এখনও আরবী জানা অনেক ইহুদী-খ্রিস্টান আছে। আরবী তাদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও এখনও কোনো আরব কিংবা নন-আরব কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ ভুল প্রমাণিত করতে পারেনি।'

রায়হান শিকদার এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। 'এমনও তো হতে পারে, তখনকার সময়ে এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে—যেটা কুরআনের চ্যালেঞ্জকে ভুল প্রমাণিত করে; কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিকগণ সেই তথ্য ধামাচাপা দিয়েছেন।'

এরকম অদ্ভুত কথা শুনে আরজু এক ফালি হেসে নিল। 'এরকম চাঞ্চল্যপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটলে আপনার কথা অনুয়ায়ী মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এটা লিপিবদ্ধ না করলেও যারা ইসলামের বিরোধী ছিল তারাও তো অন্তত লিপিবদ্ধ করত। এখন যেমন ইসলামের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করা লোকের অভাব নেই, তখনকার সময়েও এরকম লোকের অভাব ছিল না। এরকম একটা হট নিউজ কি গোপন থাকত?'

রায়হান শিকদার এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না।

'আপনি যদি মনে করেন মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই তথ্য ধামাচাপা দিয়েছেন তাহলে এই বিষয়ে অমুসলিম ঐতিহাসিকেরা কী বলেছেন সেটা আপনাকে দেখাই, তাদের কথা তো ওহীর মতো আপনারা বিশ্বাস করেন।'

এই বলে আরজু পকেট থেকে মোবাইল বের করল। আর. জে. আরবেরি তার *The Holy Koran- An Introduction with Selections* বইয়ে লেখেন—

> এ কথা অনস্বীকার্য যে, কুরআন লেখনীর দিক দিয়ে অনতিক্রম্য। স্বতন্ত্র গুণে গুণান্বিত এ গ্রন্থ। এতে ভাষার প্রকাশভঙ্গী বৈশিষ্ট্যমূলক, অথচ বিস্ময়করভাবে সহজ সরল। ছন্দ ও লয়ের উপস্থিতি এর বর্ণনারীতির অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। এরকম লেখা সত্যি অনুকরণের অতীত।[১]

ড. লরা ভ্যাগলিয়েরি লেখেন—

> কুরআন ইসলামের মূল বিস্ময় এক ধারাবাহিক ও অব্যাহত বর্ণনারীতিতে এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে নিশ্চিত সত্যের সংবাদ। এ এমন এক গ্রন্থ—যার অনুকরণ করা যায় না। এর প্রতিটি আয়াত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অথচ আকারে যথার্থ—খুব দীর্ঘ নয়, আবার খুব সংক্ষেপও নয়। এর ভাষাশৈলী মৌলিক। অতীত আরবী সাহিত্যাঙ্গনে এর সমকক্ষ কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না।[২]

আলফ্রেড গিয়োম লেখেন—

> বহু আরব-খ্রিস্টান কুরআনের রচনাশৈলীকে সমীহের চোখে দেখে আর অধিকাংশ আরবই এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে।[৩]

---

[১] The Holy Koran- An Introduction with Selections, A. J. Arberry, Page 28

[২] Valigeri, Dr. Veccia, Page 40

[৩] *Ismal*, Alfred Guillaume, Page 74

এবার আরজু এমন একটি কথা বলল—যা শুনে রায়হান সাহেবের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল- 'এমনকি আবু জাহেলও কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়!'

'ইউ মিন, ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহেল!'

'হ্যাঁ, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ফেরাউন; সেই আবু জাহেলও কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।' তখনকার সময়ে এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করত। কোনো গোত্র কোথাও ১০০ দিরহাম দান করলে তার প্রতিযোগী গোত্র সেখানে ২০০ দিরহাম দান করত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। সেই আবু জাহেল একবার বলল, 'বনু হাশিম যা-কিছু করেছে আমরা তাদের প্রতিযোগিতা করেছি; কিন্তু এখন তারা এমন কিছু নিয়ে এসেছে (কুরআন), যার সাথে আমরা কখনই পারব না।'

এতোসব প্রমাণের পরও কি বলবেন, কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রচনা?'

রায়হান শিকদার 'হ্যাঁ-না' কিছুই বলছেন না। তার এই নীরবতা প্রচণ্ড ঝড়ের পর স্তব্ধ হয়ে যাওয়া পৃথিবীর মতো মনে হচ্ছে। এই স্তব্ধতার মধ্যে আরজু আর থাকতে চাইল না। ফুফাকে এবার একা কিছুক্ষণ ভাবতে দেওয়া দরকার।

'আর হ্যাঁ, এই চ্যালেঞ্জ তো এখনকার সময়ের জন্যও প্রযোজ্য। আর আল্লাহ বলেই দিয়েছেন—

You will never able to do, তোমরা তা কখনই পারবে না।'[১]

শেষ কথাটি বলে আরজু রুম থেকে বের হয়ে গেল। ফুফুকে বলে বাড়ির বাইরে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করল আরজু। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল বৃষ্টি হতে পারে। হয়তো কিছুক্ষণ পর-ই পুরো শহর ভিজে যাবে বৃষ্টিতে।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪

জান্নাতে সমকামিতা

স্টেশনে বসে ট্রেনের অপেক্ষা করছি। ট্রেন ছাড়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে আমরা স্টেশনে পৌঁছে যাই। পূজার ছুটিতে আমাদের বাসায় এসেছিল আরজু, একসাথে এখন ঢাকায় ফিরছি। ছেলেরা ফ্লাক্সে করে চা বিক্রি করছে। তাদের ফ্লাক্সের চা যে গরম সেটা জানান দিচ্ছে 'চা গ্রম...চা গ্রম' বলে।

আরজু বলল, 'তোদের সিলেটের মানুষ তিন বেলা ভাত না খেয়ে থাকতে পারবে হয়তো; কিন্তু তিন বেলা চা না খেয়ে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।'

আমরা যেখানে বসে আছি তার ঠিক সামনে বসে এক মাঝবয়সী লোক আর একটা ছেলে অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়া করছে। দেখে মনে হচ্ছে ছেলেটা তার নিজের ছেলে। আস্তে আস্তে তাদের ঝগড়ার মাত্রা বাড়ছে। আরজুকে বললাম, 'আয় দেখে আসি ওখানে কী হচ্ছে।'

'আরে থাক, পারিবারিক কোনো ঝামেলা থাকতে পারে হয়তো।'

'আয় গিয়ে দেখি। পারিবারিক ঝামেলা হলে চলে আসব আর এমনি সাধারণ কিছু হলে ছেলেটাকে বোঝাব, বাবার সাথে এরকম কথা বলতে নেই।'

আমার কথা শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরজু এলো। তাদের কাছে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'আঙ্কেল, কোনো সমস্যা?'

আমাদের দুজনকে ভালোভাবে দেখে তিনি বললেন, 'আর কী বলব বাবা! এরকম একটা ছেলে থাকলে সমস্যা তো থাকবেই।'

ছেলেটাও পাল্টা বলল, 'হইছে হইছে! কোনোকিছুর উত্তর দিতে পারো না, শুধু শুধু অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছো।'

অপরিচিত মানুষের সামনে বাবার জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলায় লোকটি লজ্জিত হয়ে ছেলের কাছ থেকে কিছুটা দূরে গেলেন। কারণটা জানার জন্য তার পিছু পিছু আমরাও ছুটলাম।

বেঞ্চে বসে এক লম্বা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তিনি বললেন, 'ছেলেটা এম.সি কলেজে ইন্টারে পড়ে। কী-সব বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কয়েকদিন ধরে ধর্ম নিয়ে উল্টা-পাল্টা কথা বলা শুরু করেছে। আমার কাছে প্রশ্ন করে; আমি তো বাবা এতো পড়াশোনা জানা লোক না, তাই তার বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। এই নিয়ে তো সে সবসময় বলে, তোমাদের ধর্ম অবৈজ্ঞানিক, কোনোকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কয়েকদিন আগে সমকামিতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, এটা নাকি মানুষের অধিকার। ছেলেকে কোনোভাবে বোঝাতে পেরেছি যে, এটা কোনো মানবাধিকার নয়; বরং পাপাচার। তখন কষ্ট করে আমার কথা মেনে নিলেও এখন বলছে কুরআনে নাকি আছে জান্নাতে সমকামী থাকবে পুরুষের জন্য। আমি তো আর ওর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না, বাবা। তাই ঢাকায় ওকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে একজন ওর সব প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কী আছে সেটা দেবেন।'

লোকটির হতাশ মুখচ্ছবি দেখে আফসোস লাগল, আজকালকার ছেলেগুলো ধর্ম-বিমুখ হয়ে কেবল নাস্তিকই হচ্ছে না, আশেপাশের মানুষগুলোকেও বিভ্রান্ত করছে।

ছেলেটির কাছে গিয়ে বসলাম। তার নাম সায়েম। সে সাইন্সের স্টুডেন্ট আর আরজুও ছিল সাইন্সের স্টুডেন্ট। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের মধ্যে সখ্য গড়ে উঠল।

আরজু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সায়েম, কুরআনের কোন আয়াত পড়ে তোমার মনে হয়েছে যে, জান্নাতে সমকামীদের কথা আছে?'

সায়েম মোবাইল বের করে কোনো একটা ওয়েবসাইটে ঢুকল। তারপর কুরআনের ওই আয়াতটির অনুবাদ পড়া শুরু করল,

সূরা ওয়াকিয়ার ১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

তাদের (জান্নাতের পুরুষের) সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ।

সূরা তূর এর ২৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

সুরক্ষিত মুক্তো সদৃশ কিশোরেরা সেখানে তাদের জন্য নিয়োজিত থাকবে।

সূরা ইনসানের ১৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

তাদের পরিবেশন করা হবে চির কিশোরগণ, তাদের দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তো।

আয়াতগুলো দেখে দেখে পড়ার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে সায়েম বলল, 'এই আয়াতগুলো পড়েই তো বোঝা যায়—জান্নাতে সুদর্শন কিশোর রাখার পেছনে আল্লাহ সমকামিতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।'

সায়েমের কথা শুনে আরজু হেসে বলল, 'তুমি সাইন্সে পড়ো, ভাবছিলাম, অনেক জটিল কোনো প্রশ্ন করবে; কিন্তু তুমি এমন একটা প্রশ্ন করেছ যে, না হেসে পারলাম না! আচ্ছা, তুমি কি জানো যে, তোমার বাবা একজন সমকামী?'

আরজুর প্রশ্ন শুনে সায়েম আঁৎকে উঠল। আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'অসম্ভব, এ হতে পারে না। আমার কয়েকটা বন্ধু সমকামিতাকে সাপোর্ট করে এই জন্যই বাবা আমাকে ওদের সাথে মিশতে দেন না, তাহলে বাবা কীভাবে সমকামী হবেন?'

'দেখো, তুমি যখন জন্মগ্রহণ করেছ, তখন তোমার বাবা খুশি হয়েছেন। তুমি একজন ছেলে, তিনিও তোমার সমান লিঙ্গের, অর্থাৎ পুরুষ। তুমি জন্মগ্রহণ করায় তোমার বাবা যেহেতু খুশি হয়েছেন সেহেতু তিনিও একজন সমকামী!'

সায়েম বিরক্ত সুরে বলল, 'এ আবার কেমন কথা! ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে এমনিতেই তো বাবা এবং আত্মীয়-সৃজন খুশি হন। এতে কি তারা সমকামী হয়ে যান?'

'আচ্ছা, বাদ দাও এটা। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন নিশ্চয়ই তোমার বাবা, চাচা, মামা তোমাকে কোলে নিয়ে আদর করেছেন, চুমো দিয়েছেন তাই না?'

সায়েম মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, দিয়েছেন তো, এটা তো সব বাবা, চাচা, মামা করেন।'

'তাহলে তো তারাও সমকামী; কারণ, তারা পুরুষ হয়েও সমলিঙ্গের ছেলেকে চুমো দিয়েছেন!'

সায়েম আবারও বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী বলছেন এসব বাবা-চাচা-মামা—এরা চুমো দিলে তো সমকামী হয়ে যান না। এটা তো একান্ত স্বভাবজাত ভালোবাসা থেকে দেন।'

'এই তো ঠিক বলেছ, যে ছেলেকে ছোটবেলায় বাবা চুমো দিতেন বড় হবার পর দেন না। তার মানে এটা না যে, বড় হলে বাবা আর ছেলেকে ভালোবাসেন না; বরং ভালোবাসা প্রকাশের ভঙ্গি তখন চেঞ্জ হয়। আর এটা মানুষের স্বভাব যে বাচ্চাদের দেখলে আদর করতে মন চায়। ছোটবেলায় বাবা তোমাকে আদর করতেন, সামান্য বড় হয়ে যখন তুমি কিশোর হলে তখন পাড়ার লোকেরাও তোমাকে আদর করেছে; এই আদরকে যদি তুমি সমকামিতা না বলো—তাহলে তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, জান্নাতে পুরুষেরা সুদর্শন সেই কিশোরদের আদর করবে, সেই আদরকে তুমি কীভাবে সমকামিতা বলবে?'

সায়েম নিশ্চুপ, এখন যদি সে জান্নাতের কিশোরদের আদর করাকে সমকামিতা বলে তাহলে তাকে মেনে নিতে হবে বাচ্চাকালে বা কিশোরকালে যারা তাকে আদর করেছেন তারা সবাই সমকামী ছিলেন; এমনকি তার বাবা, চাচা, মামারাও। সমকামিতাকে সাপোর্ট করা বন্ধুদের ডিফেন্স করা যায়; কিন্তু সেজন্য তো আর নিজের বাবা-চাচাকে সমকামী বলা যায় না—যারা কি না সমকামিতাকে সাপোর্ট করা বন্ধুদের সাথে মিশতেও মানা করেন।

এবার সমকামিতা ছেড়ে স্বাভাবিক কথায় এলো আরজু, 'আচ্ছা, ঢাকায় গিয়ে কোথায় উঠবে?'

'ঢাকায় তো আমাদের কোনো আত্মীয় নেই, তাই হোটেলেই উঠতে হবে।'

'এর আগে কি কখনও হোটেলে থেকেছ?'

'হ্যাঁ, জাফলং গিয়ে একবার হোটেলে থেকেছি।'

'হোটেলে কি সুদর্শন হোটেল বয় (boy) দেখেছ? যারা খাবার কিংবা কিছু দরকার হলে নিয়ে আসে, আশেপাশে ঘোরাফেরা করে।'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো, সাদা পোশাক পরে থাকে তারা।'

আরজু মুচকি হেসে সায়েমকে বলল, 'আচ্ছা, কিছু মনে কোরো না। ওই সুদর্শন হোটেল বয়দের সাথে কি তুমি কোনো খারাপ ব্যবহার করেছ? মানে ওই সমকাম, ওইরকম কিছু?'

সায়েম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছেন এই সব ওদের সাথে আমি এমন করতে যাব কেন?'

'পবিত্র কুরআনে জান্নাতের সুদর্শন সেসব কিশোরদের কথা বলা হয়েছে; ঠিক যেরকম তুমি জাফলংয়ে হোটেল বয়দের দেখেছ। তবে জান্নাতের ওই সব কিশোর তোমার দেখা ওই সব হোটেল বয়দের মতো না, জান্নাতের নিয়ামত এমন যে—যা দুনিয়ার কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, আর কোনো মানবহৃদয় কল্পনাও করেনি। তারওপর জান্নাতে এরকম পাপ কাজ করার কথা চিন্তায়ও আসবে না।'

আরজুর কথা যখন শেষ হলো তখনই প্লাটফর্মে ট্রেন এলো। সায়েমকে দেখে মনে হলো, সে তার প্রশ্নের উত্তর মোটামুটি পেয়ে গেছে। এই প্রশ্ন নিয়ে তার বাবার সাথে ঢাকা যাবার পথে আর তর্ক করবে না।

সায়েমের বাবা, সায়েম, আমি আর আরজু ট্রেনে উঠলাম। আমরা 'ট' বগিতে আর সায়েমরা 'চ' বগিতে। হর্ন বাজিয়ে ট্রেন ছুটল। তখন মনে পড়ল শামসুর রহমানের 'ট্রেন' কবিতাটি—

ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে রাত দুপুরে ঐ
ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে ট্রেনের বাড়ি কই?

সূরা লাহাব নিয়ে যত মিথ্যাচার

সিলেট থেকে জার্নি করে এসে অনেক ক্লান্ত লাগছে। বিছানায় শুয়ে আছি। আরজু শুয়ে শুয়ে আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচের *Islam Between East And West* বইটি পড়ছে।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনলাম। দরজা খুলে দেখি সায়েম আর তার বাবা দাঁড়িয়ে, ট্রেন স্টেশনে যাদের সাথে দেখা হয়েছিল। তাদের ভেতরে বসতে দিলাম। তাদের দেখে আমরা যেমন অবাক হলাম, তেমনই আমাদের দেখে তারাও অবাক হলেন। তাদের নাশতা করানোর জন্য আমি নিচে গিয়ে কয়েকটা গরম গরম সিঙ্গারা কিনে আনলাম।

গরম সিঙ্গারায় কামড় দিতে দিতে সায়েমের বাবা বললেন, 'আচ্ছা, আরজু নামে একজন লোক এখানে আছেন না? তার খোঁজেই মূলত আমি ঢাকায় এসেছি। ছেলেটার সব প্রশ্নের উত্তর আমার মনে হয় তিনিই দিতে পারবেন। অনেক কষ্ট করে তার ঠিকানা জোগাড় করে এখানে আসলাম। আচ্ছা বাবা, তাকে কোথায় পাব?'

তাদের দেখে যত না অবাক হয়েছি, তার এই কথা শুনে তারচেয়েও বেশি অবাক হলাম। আরজুর খোঁজে একজন মানুষ সিলেট থেকে ঢাকা এসেছেন, চিন্তা করা যায়?

আরজুর দিকে ইশারা দিয়ে বললাম, 'স্টেশনে যে-ব্যক্তি সায়েমের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছে, সে-ই আরজু।'

সায়েমের বাবা আরজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার অনেক নাম শুনেছি, বাবা।'

নিজের প্রশংসা শোনায় কান না দিয়ে সায়েমকে আরজু জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী প্রশ্ন তোমার, সায়েম?'

সায়েমের মুখভঙ্গি দেখে মনে হলো, সেও আরজুর সম্পর্কে অনেক শুনেছে, স্টেশনে বসে কথা বলা আরজুর সাথে যেভাবে প্রশ্ন করতে পারছে, এই আরজুর সাথে কথা বলতে একটু দ্বিধা করতে লাগল।

'You can ask me frankly, Don't need to shy while learning and eating.' এই বলে খিলখিল করে হাসল আরজু।

সায়েম কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আরজু ভাই, কুরআনে একটি সূরা আছে, নাম লাহাব। এই সূরায় নবীর শত্রু আবু লাহাবকে অভিশাপ দেওয়া হয় অর্থাৎ তার ধ্বংস কামনা করা হয়। এছাড়াও আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলারও ধ্বংস কামনা করা হয়। এই রকম একটা সূরা পড়ে কী এমন লাভ হয়? এটা তো একটা অপ্রয়োজনীয় সূরা!'

ছোটবেলায় সূরাটি মুখস্ত করেছিলাম, কয়েকদিন আগে এর অর্থ জানলাম। সায়েমের প্রশ্ন শুনে আমি একটু আগ্রহ নিয়ে বসলাম এটা দেখার জন্য যে, আরজু কী উত্তর দেয়।

আরজু বলল, 'আগে বলে নিই, আবু লাহাব আর তার স্ত্রী কারা ছিল। আবু লাহাব ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আর উম্মে জামিলা ছিল তার চাচী, আবু লাহাবের স্ত্রী। তারা দুজনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব কষ্ট দিত। মক্কার সবাইকে একত্র করে নবীজি তাদের দাওয়াত দিলে আবু লাহাব নবীজিকে অভিশাপ দেয়। আর তার স্ত্রী উম্মে জামিলার গলায় একটা হার ছিল, সে এটা নিয়ে খুব গর্ব করত। সে বলত, লাত-ওজ্জার শপথ! মুহাম্মাদের বিরুদ্ধাচরণের কাজে আমি আমার হারটি ব্যয় করব।'

সিঙ্গারাগুলো সব শেষ হয়ে গেলে আমি আরও কয়েকটা আনতে যাব, সায়েমের বাবা আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, 'না, বাবা। আর লাগবে না। তুমি বসো এখানে।'

আরজু বলে চলল, 'এখন তাহলে সূরাটির অনুবাদ পড়ি—

[১] ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। [২] তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। [৩] অচিরেই সে শিখাবিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। [৪] এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে। [৫] তার গলদেশে খর্জুর বাকলের রজ্জু রয়েছে।

এখানে দেখার বিষয় যে, আবু লাহাবের ধ্বংস কামনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তার মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না। আর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে; কারণ, সে ঈমান আনবে না।

আচ্ছা, সায়েম তুমি কি জানো, এই সূরা নাযিল হবার ক'বছর পর আবু লাহাব মৃত্যুবরণ করেছিল?'

সায়েম মাথা নেড়ে বলল, 'না ভাই, জানি না।'

'এই সূরা নাযিল হবার প্রায় ১০-১২ বছর পরে আবু লাহাব মৃত্যুবরণ করে! এই দীর্ঘ সময়ে তার সামনে সুবর্ণ সুযোগ ছিল মুসলিম হয়ে যাওয়ার। সে যদি মুসলিম হয়ে যেত তাহলে কুরআন ভুল প্রমাণিত হতো। কারণ, কুরআন অনুযায়ী সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। সে যদি একবার দাবি করত যে, 'আমি মুসলিম হয়ে গেছি' তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হতেন। আস্তে আস্তে মানুষজন তার কাছ থেকে দূরে সরে যেত; কিন্তু এটা হয়নি, আর আবু লাহাবও কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে পারেনি।'

'দেখেন, আরজু ভাই, আমি যতদূর জানি, আরবের অনেক বড় বড় নেতা ইসলাম গ্রহণ করেননি এই ভেবে যে, লোকেরা তাদের কী বলবে! শেষ পর্যন্ত বাপ-দাদাদের দ্বীন ছেড়ে মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করলে সবাই তাদের ধিক্কার জানাবে। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবও এই ভেবে ইসলাম গ্রহণ করেনি। সো, এই ভবিষ্যদ্বাণী তেমন কোনো আশ্চর্যের কিছু না।'

আরজু একটু হেসে বলল, 'তখন আরবের অনেক নেতা ছিল; কিন্তু বাকিদের সম্পর্কে তো আর এমনটা বলা হয়নি। যেমন আবু সুফিয়ান এবং তার স্ত্রী হিন্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আবু সুফিয়ান আর তার স্ত্রী হিন্দা সম্পর্কে তো এমন ধ্বংসের কথা বলা হয়নি; বরং দেখা যায় ৬৩০

খ্রিষ্টাব্দে সেই আবু সুফিয়ান মুসলমান হয়েছে। এছাড়াও মক্কার কাফিরদের প্রধান নেতা আবু জাহেলের পুত্র ইকরিমাও মুসলমান হয়েছে। তাদের সম্পর্কে তো আর ধ্বংসের কথা বলা নেই।

আর আরেকটা বিষয়, কুরআনে বলা আছে আবু লাহাবের ধ্বংসের কথা। তুমি কি জানো, আবু লাহাবের কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল?'

সায়েম আবারও মাথা নেড়ে বলল, 'না ভাই, জানি না।'

'আবু লাহাবের সমস্ত শরীরের মাংস পচে যায়। মৃত্যুর ৩ দিন পর্যন্ত তার পরিবারের কেউ তার কাছে আসেনি। আবু লাহাবের লাশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। ফলে মক্কাবাসী তার পরিবারকে ধিক্কার জানায়। এরপর তারা আবু লাহাবকে একটা গর্তে পুঁতে রেখে আসে। সূরা লাহাবে আল্লাহ বলেছেন, আবু লাহাবের ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি।

সর্বদা ধন-সম্পদ নিয়ে বড়াই করা আবু লাহাবের ধন-সম্পদ আসলেই কোনো কাজে আসেনি। আর তার স্ত্রী যে তার গলার হার নিয়ে গর্ব করত, সেও মারা যায় গলার হারে ফাঁস লেগে। এরকম একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা সূরা কীভাবে অপ্রয়োজনীয় সূরা হতে পারে?'

সায়েমকে দেখে মনে হলো, সে তার উত্তর মোটামুটি পেয়েছে। আবার জিজ্ঞেস করল, 'আসলে এই সূরা বর্তমানে আদৌ কি আমাদের কাজে আসছে। ভবিষ্যদ্বাণী তো এখন অতীত হয়ে গেছে। এখন আমরা এই সূরা তেলাওয়াত করলে কী লাভ হবে?'

'দেখো, আমাদের সমাজে অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত লোক আছে। তাই না?'

'হ্যাঁ, আছে তো।'

'তাহলে তারা যখন এই সূরা তেলাওয়াত করবে তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠবে এই জন্য যে, যেখানে আবু লাহাবের ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসেনি, সে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। সেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদেরও তো ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না।

তাছাড়া, যাদের টাকা আত্মসাৎ করে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে সেই দুর্নীতির শিকার লোকেরা এই ভেবে সান্ত্বনা পাবেন যে, আল্লাহ অবশ্যই

তাদের বিচার করবেন; যেমনটা আবু লাহাবের ক্ষেত্রে করেছেন।'

সায়েম চুপ করে থাকল, তার কাছে সম্ভবত এই নিয়ে আর কোনো পাল্টা যুক্তি দেবার ছিল না।

সায়েমের বাবা আরজুর উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়ে সায়েমকে বললেন, 'আর কোনো প্রশ্ন থাকলে কর। পরে বাসায় গিয়ে আমাকে জ্বালাইস না।'

সায়েম বলল, 'না বাবা, আমার আর কোনো প্রশ্ন নাই।'

সেদিনের মতো সায়েম আর তার বাবা চলে গেলেন, যাবার সময় আরজুর ফোন নাম্বার নিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে দেখতাম, সায়েম আরজুকে ফোন করে নানানরকম প্রশ্ন করত। আরজু সময় নিয়ে সেগুলোর উত্তর দিত।

এর কয়েকদিন পর সায়েমের বাবা আরজুকে ফোন করলেন। আরজু রুমের বাইরে ছিল তাই ফোনটা আমি রিসিভ করলাম। সায়েমের বাবা কাঁদোগলায় বললেন, 'বাবা, আমার ছেলেটা সুপথে ফিরেছে। এখন নিয়মিত নামাজ পড়ছে। তুমি না থাকলে হয়তো আমার ছেলেকে সুপথে ফেরাতে পারতাম না।'

এই পর্যন্ত বলে হাউমাউ করে কান্না শুরু করলেন সায়েমের বাবা। আমি ফোনটা রেখে দিলাম। চোখের কোণে আমারও দু-ফোঁটা পানি জমল। মনে মনে বললাম, 'হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ।'

উৎসব সবার?

'তোকে না মানা করেছি, সবকিছুতে প্রতিবাদ না করতে?' রুম থেকে বের হয়ে একটু কড়া সুরে আরজুকে বললাম।

আমার কথায় তার কোনো ভাবান্তর হলো বলে মনে হচ্ছে না। নির্বিকারভাবে সে হাঁটছে। হয়তোবা এই নির্বিকার ভাবের মধ্যে থাকতে পারে একপ্রকার রাগ। কারণ, আমার এই রকম আদরমাখানো সাবধানতার জবাবে আরজু সবসময় ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর একটা উক্তি বলত— If I remain silent and you remain silent, then who will teach the ignorant? কিন্তু আজকে আর সেই উক্তি পুনরাবৃত্তি করছে না।

আমি আর আরজু হেঁটে যাচ্ছি রাজিব ভাইয়ের রুমে। রাজিব ভাই আমাদের হলের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি, অনেক পাওয়ারফুল। পূজা দেখতে গিয়ে রাজিব ভাই ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড দেন। ক্যাপশন দেন 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। রাজিব ভাইয়ের সেই পোস্টে গিয়ে আরজু কমেন্ট করে। যুক্তি দেখায় 'আসলে ধর্ম যার, উৎসব তার'। পোস্টে বাকিরা যেখানে 'সহমত ভাই' লিখে কমেন্ট করছে, সেখানে আরজুর এমন কমেন্ট দেখে রাজিব ভাই ক্ষেপছেন। জুমআর নামাজ শেষে আমার সাথে দেখা হলে রাজিব ভাই বললেন, 'তোমার বন্ধুকে নিয়ে একটু পরে রুমে এসো।'

না জানি আমাদের ভাগ্যে আজকে কী আছে। হয়তোবা গিয়ে দেখব সবাই লাঠি আর স্ট্যাম্প নিয়ে বসে আছে আরজুকে পেটানোর জন্য।

৪০৫৬ নাম্বার রুমে রাজিব ভাই থাকেন। দরজার সামনে গিয়ে নক করলাম। 'আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি আরিফ। রুমে ঢুকব?'

ভেতর থেকে সাড়া পেয়ে রুমে ঢুকলাম। যেমনটা ভেবেছিলাম তার কিছুই দেখতে পেলাম না। রাজিব ভাই একাই রুমে বসে আছেন। টিভিতে খেলা দেখছেন। বার্সেলোনা আর সেভিয়ার হাইলাইটস ম্যাচ। রাজিব ভাই যে খেলাপ্রেমিক—সেটা রুমে ঢুকলেই বোঝা যায়। দেওয়ালে মেসির বেশ কয়েকটি ছবি টানানো। দুটো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। ভাইয়ের সামনে চেয়ারে বসতে প্রথমে ইতস্তত বোধ করলেও পরে ভাইয়ের চোখরাঙানি দেখে চেয়ারে বসলাম।

টিভি বন্ধ করে আরজুর দিকে তাকিয়ে রাজিব ভাই বললেন, 'তোমার লেখাগুলো আমি পড়ি, ভালো লাগে; কিন্তু 'ম্যানার' বলতে যে একটা জিনিস আছে সেটা তোমার মধ্যে অনুপস্থিত।'

আমাদের হলগুলোতে যে কয়েকটা কী-ওয়ার্ড আছে তার মধ্যে 'ম্যানার' হলো একটা। হলে ওঠার পর ফার্স্ট ইয়ারের শিক্ষার্থীদের আদব-কায়দা শেখানো হয়। পলিটিক্যাল বড় ভাইকে এক কিলোমিটার দূরে দেখলেও দৌড়ে গিয়ে সালাম দিতে হবে, ভাইয়ের সব কথায় 'সহমত ভাই' বলতে হবে (প্রতিবাদ করা যাবে না), ভাইয়ের ফেসবুক পোস্টে লাভ রিএক্ট দিতে হবে, ক্যাপশনে তিনটা লাভ ইমোজি দিয়ে ভাইয়ের স্ট্যাটাস শেয়ার দিতে হবে—এগুলো হলো হলের ম্যানার। হলে থাকতে গেলে এই সব ম্যানার কেয়ার করতে হয়; কিন্তু আরজু এগুলো থোড়াই কেয়ার করে।

'আমি পূজায় গিয়ে তো আর ওদের সাথে পূজা করছি না, শুধু তাদের উৎসব দেখার জন্য গিয়েছি। তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কয়েকটা ছবি তুলেছি। একজন মানুষ হিসেবে তো আমরা এগুলো করতে পারি। সবকিছুতে তুমি এতো ধর্ম টেনে আনো কেন? তোমার এরকম সাম্প্রদায়িকতা আমি আগেও লক্ষ করেছি।'

রুমে ঢোকার আগে ভেবেছিলাম রাজিব ভাই হয়তো খুব কড়া ভাষায় কথা বলবেন, অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহার করবেন; কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে একেবারে হালকাভাবে না হলেও একটু কড়া সুরে কথা বলছেন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আরজুকে তার আর্গুমেন্ট প্রেজেন্ট করার সুযোগ দিচ্ছেন।

নেতার সামনে কথা বলতে গিয়ে অনেকের হাত-পা কাঁপে; কিন্তু আরজু বেশ স্বাভাবিকভাবেই কথা বলা শুরু করল। রাজিব ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রুমে টানানো মেসির ছবির দিকে তাকিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, 'ভাইয়া মনে হয় আর্জেন্টিনার সাপোর্টার?'

সিরিয়াস মুহূর্তে এরকম প্রশ্ন শুনে রাজিব ভাইও ঘাবড়ালেন না। স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'হুম, ডাই হার্ড ফ্যান।'

'২০১৪ সালের ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন আর্জেন্টিনা গোল খেয়ে হারে, তখন নিশ্চয়ই অনেকে খারাপ লেগেছে?'

'খারাপ লেগেছে মানে? অনেক কষ্ট করে কান্না থামিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু মেসির কান্না দেখে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। আমিও কান্নায় ভেঙে পড়ি। শিশুদের মতো কেঁদেছি।'

সেই দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাজিব ভাইয়ের গলা ভারী হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে কেঁদে ফেলবেন তিনি।

আরজু এবার একটা উদ্ভট প্রশ্ন করল। 'আচ্ছা ভাই, ওই দিন যদি মেসি জার্মানির অধিনায়ক ফিলিপ লামের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্বকাপটা চেয়ে নিত, তারপর বিশ্বকাপ হাতে নিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করত 'জয়-পরাজয় যার যার, উৎসব সবার' লিখে, তখন নিশ্চয় আপনার মন ভালো হয়ে যেত। মেসির হাতে বিশ্বকাপ দেখে।'

'পাগলের মতো এগুলো কী বলছ? কাপ জিতল জার্মানি, আর মেসি সেখানে তাদের কাপ নিয়ে সেলিব্রেশন করবে কেন? মেসি তো এতো বোকা না।'

'না মানে, কথার কথা বললাম আর কী। মেসি যদি এভাবে সেলিব্রেশন করত তবে আপনার কেমন লাগত?'

রাগতস্বরে রাজিব ভাই বললেন, 'মেসির প্রতি যতটুকু রেস্পেক্ট ছিল সেদিন সবটুকুই উবে যেত!'

মেসির প্রসঙ্গা শেষ হলে এবার আরজু বলল, '২০১২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে এশিয়া কাপের ফাইনালে বাংলাদেশ ২ রানে হারে। তীরে এসে তরী ডুবানো সেই

ম্যাচে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা যখন ট্রফি উঁচিয়ে সেলিব্রেশন করছিল, মাঠে তখন সাকিব-মুশফিক হাউমাউ করে কাঁদছিল।'

'হুম। সেই দিনও সাকিবের কান্না দেখে আমি কেঁদেছিলাম। আমি কেন? সেদিন পুরো বাংলাদেশ কেঁদেছে।'

'সাকিব-মুশফিকরা তো সেদিন ডাই-হার্ড ট্রাই করছে ম্যাচ জেতার জন্য। তাই না?'

'অফকোর্স।'

'আচ্ছা ভাই, চেষ্টা করেও যেখানে বাংলাদেশ ম্যাচ জিততে পারেনি সেখানে পরাজয়ের গ্লানি মোছার জন্য যদি সাকিব-মুশফিকরা পাকিস্তানের সাথে গিয়ে সেলিব্রেশন করত, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সাথে হাসিমুখে ছবি তুলে ক্যাপশন লিখত 'জয়-পরাজয় যার যার, উৎসব সবার' তখন কী হতো?'

'কী হতো মানে? ইন্সট্যান্ট সবাই মিছিল বের করত সাকিব-মুশফিক রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়!'

একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'আমি কিন্তু বুঝলাম না, তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম কী, আর তুমি বলছ কী?'

আরজু এবার একটু নড়েচড়ে বসল। আমার হৃদস্পন্দন ক্রমশ বাড়ছে। হলের সবচেয়ে বড় নেতার সামনে আরজু এ কেমন মজা করছে!

'আমি আমার টপিক নিয়েই কথা বলছি ভাই। এজ এ পলিটিশিয়ান আপনি নিশ্চয় জানেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বিতর্কিত দিন ১৫ই আগস্ট।'

'হ্যাঁ, ওই দিন একদল শোক দিবস পালন করে আর আরেক দল সেলিব্রেট করে তাদের নেত্রীর বার্থডে।'

'রাজিব ভাই, ওই দিন কেন দুই দল একইসাথে দুই সেলিব্রেশনে যোগ দেয় না? দিনের প্রথমভাগে ওইদলের নেত্রীর বার্থডে পার্টিতে সবাই যাবে, দিনের শেষভাগে সবাই মিলে যাবে বঙ্গাবন্ধুর কবর জিয়ারতে।'

'আরজু, হ্যাভ ইউ গান ম্যাড? দুটো বিপরীত আদর্শের রাজনৈতিক দল একই প্লেটে ভাত খাবে—এটা চিন্তা করা যায়? আলাদা আলাদাভাবেও যে দুই দল সেলিব্রেশন করবে সেখানেও বাধা আছে। ছাত্রলীগের সেক্রেটারি কড়া ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন, '১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে খালেদা জিয়া জন্মদিন পালন করলে তা প্রতিহত করবে ছাত্রলীগ।' বিপরীত দলও কম যায় না। একবার জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গাবন্ধুকে নিয়ে শোকাত্মক স্ট্যাটাস দেওয়ায় ছাত্রদলের এক কেন্দ্রীয় নেতাকে বহিষ্কার করে ছাত্রদল। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি এগুলো কেন টেনে নিয়ে আসছ। আরজু, স্টেট-ফরোয়ার্ড কথা বলো।'

'হ্যাঁ ভাই, এবার আসি আসল কথায়। জীবনের কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে আমরা সবাই 'সাম্প্রদায়িক'। হোক সেটা প্রিয় দলের সেলিব্রেশন করা, না-করা নিয়ে কিংবা বিপরীত মতাদর্শের কোনো সেলিব্রেশনে যোগদান না করে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ইসলামের সাথে মূর্তিপূজার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করবেন না, অন্যান্য গোনাহর ক্ষেত্রে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন।[১] মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম তার নিজের জন্য এবং তার সন্তানদের জন্য দুআ করেন, আল্লাহ যেন তাদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখেন।'[২]

রাজিব ভাই আর আমি মনযোগী শ্রোতার মতো আরজুর কথা শুনে যাচ্ছি। আরজু বলে চলল...

'আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হজের ৩০ নাম্বার আয়াতে বলেন—

মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৪৮

[২] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৫

মূর্তিপূজা থেকে এমনভাবে দূরে থাকো যেমন দুর্গন্ধময় ময়লা-আবর্জনা থেকে মানুষ নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে আসে। অনুরূপ মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকো; তা স্থায়ী শাস্তির কারণ।

ভাই, যেখানে আল্লাহ কঠোরভাবে আমাদের নিষেধ করেছেন মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকতে সেখানে মূর্তিপূজা দেখতে গিয়ে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এই স্লোগান তোলা কতটুকু যৌক্তিক? এটা প্রকাশ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা নয় কি?'

রাজিব ভাই চুপ করে রইলেন। কোনো কথা বলছেন না। আরজু বলে চলল, 'দুনিয়াবি কারণে আমরা কোনো-না-কোনো সময় 'সাম্প্রদায়িক' (অন্য সম্প্রদায়ের উৎসবে যোগদান না করে) আচরণ করি। এজ এ মুসলিম, আমাদের লক্ষ্য যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আরেক সম্প্রদায়ের উৎসবে না যাওয়াই তো স্বাভাবিক। তাই নয় কী?'

রাজিব ভাইয়ের রুমে ঢোকার আগে মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম আজকে ভাগ্যে কী আছে এটা নিয়ে। রুম থেকে বের হবার পর একটা ইংরেজি প্রবাদ মনে পড়ল— Fortune favors the brave, ভাগ্য সাহসীদের পক্ষে থাকে।

আরজুর আর্গুমেন্টস শোনার পর রাজিব ভাই এরকম রিঅ্যাকশন করবেন সেটা চিন্তাও করতে পারিনি।
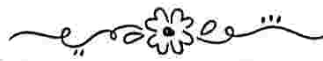
সম্প্রসারণশীল বিশ্ব

বিবিএ'র শিক্ষার্থী কেন সাইন্স পড়বে?

সেকেন্ড সেমিস্টারে আমাদের কোর্সগুলোর মধ্যে যখন General Science অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ক্লাসের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এই প্রশ্ন তুলল। প্রথম দিকে ফিজিক্সের সামান্য মৌলিক ধারণা যেমন—নিউটনের ৩টা সূত্র, ইলেক্ট্রন, প্রোটন আর এসবের গঠন সম্পর্কে স্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা যখন করেন তখনই ক্লাসের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী প্রতিবাদী কণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'আমরা বিবিএতে পড়ি, আমরা ব্যাবসা সম্পর্কে পড়ব। এসব এটম, প্রোটন, নিউট্রন পড়ে আমাদের কী হবে?'

ক্লাসের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর যখন এই প্রশ্ন, তখন আরজু দিব্যি মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করত। আর জেনারেল সাইন্সের ক্লাস শুরু হলে বাকিরা রাতের ঘুম বিকালের ক্লাসে ঘুমিয়ে নিত!

সাইন্স সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ আরজুর। সাধারণ একটা জেনারেল সাইন্সের বই পড়লেই যেখানে কোর্সটিতে এ প্লাস পাওয়া যায় সেখানে আরজু জেনারেল সাইন্সের বিশদ তথ্য জানতে আরও প্রায় ১০ টি বই কিনে পড়া শেষ করেছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কার্জন হলে গিয়ে সাইন্স ফ্যাকাল্টির বন্ধুদের সাথে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। আমার ওই সবে তেমন মাথাব্যাথা নাই, জেনারেল সাইন্সে কোনো রকম 'এ' পাইলেই হবে।

এক শুক্রবারে নিউমার্কেট থেকে একটা প্যান্ট কিনতে যাব। দর কষাকষিতে আমি একেবারেই অজ্ঞ। একবার এক পাঞ্জাবির দাম বলেছিল ১৮০০ টাকা, আমি আর

কী বলবো? বললাম ১৪০০ টাকা দিই। আমার কথা শুনে দোকানদার আর কিছু না বলে পাঞ্জাবিটা প্যাক করে দিয়ে বলল, 'আর কী লাগবে স্যার?'

পরের সপ্তাহে একই পাঞ্জাবি আরজু কিনল ৭০০ টাকা দিয়ে। এরপর থেকে কিছু কিনতে হলে আরজুকে সাথে নিয়ে কিনতে যাই।

আরজুকে বললাম, 'চল, আমার সাথে প্যান্ট কিনতে যাবি।'

আরজু বলল, সে কার্জন হলে যাবে এখন, বিজ্ঞান-আড্ডায়। নিউ মার্কেট যেতে হলে সন্ধ্যার পরে যাবে। ভাবলাম, এখন যেহেতু কোনো কাজ নেই তাহলে কার্জনে গিয়ে ঘন্টাখানেক তাদের সাইন্স-আড্ডায় যোগ দিই।

কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে আসরের নামাজ পড়ে রওয়ানা হলাম কার্জন হলের দিকে। গিয়ে দেখলাম বাকি সবাই উপস্থিত। একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী আরজু, আজকে একটু দেরি করলা যে?'

'আসরের নামাজ পড়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে আর কী।' আরজুর কথা শুনে পাশে বসা আরেকজন মুখ টিপে হাসল। আমাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল আরজু।

একেকজন একেক ডিপার্টমেন্টের। ফিজিক্সের জাহেদ, কেমেস্ট্রির অর্ক, বোটানির ইশরাক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জনি আর বায়ো কেমেস্ট্রির শাওন। সাইন্সের শিক্ষার্থী মানে চোখে চশমা থাকবে, শরীর একটু চিকন থাকবে, রাত জাগার ফলে চোখের নিচে কালো দাগ থাকবে এরকম একটা ধারণা আমার মনে ভেসে উঠল। সাইন্স ফ্যাকাল্টির এই পাঁচজন শিক্ষার্থীর মধ্যে আমার ধারণার সবগুলো গুণই বিদ্যমান।

আস্তে আস্তে বিজ্ঞান আলোচনা জমতে শুরু করল। একটু থাকার পর যা বুঝলাম, আজকের আলোচনার বিষয় Expansion theory বা সম্প্রসারণশীল-তত্ত্ব।

ফিজিক্সের জাহেদ প্রথমে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুরু করল, আমরা ছাত্রের মতো বসে বসে তার আলোচনা শুনতে লাগলাম।

'Expansion theory বা সম্প্রসারণশীল-তত্ত্ব ধারণাটি প্রমাণ করেন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল (Edwin Hubble)। ১৯২৯ সালে টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি লক্ষ করলেন যে, সুদূরের ছায়াপথসমূহ (Galaxies) আমাদের থেকে

দূরে সরে যাচ্ছে। কেবল আমাদের থেকেই না, তারা একটা আরেকটার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হাবল 'লাল অপসারণ (Redshift)' পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দুটো মৌলিক বিধি প্রণয়ন করেন—যা তার নামানুসারে হাবলবিধি বা Hubble's Law নামে পরিচিত।

লাল অপসারণের দুটো বিধি হলো—

[১] লাল অপসারণের ভগ্নাংশ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে না।

[২] লাল অপসারণ ও আপাত ঔজ্জ্বল্য এমনভাবে সংশ্লেষিত অবস্থায় থাকে যে, লাল সরণকে অপসরণ গতিবেগ এবং আপাত উজ্জ্বলতাকে দূরত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে অপসারণ গতিবেগ দূরত্বের আনুপাতিক হয়।

টেলিস্কোপের মাধ্যমে হাবল পর্যবেক্ষণ করেন যে, প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর তারা যাচ্ছেতাইভাবে সরে যাচ্ছে না; বরং তারা আমাদের কাছ থেকে সমানুপাতিক হারে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলো ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে।'

এই বলে জাহেদ সম্প্রসারণশীল-তত্ত্ব নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত লেকচার শেষ করল। জাহেদের লেকচার শেষ হলে সবাই হাততালি দিল। জাহেদের এতো সুন্দর লেকচার শুনে মনে হলো এই সম্প্রসারণশীল-তত্ত্বের প্রবক্তা এডউইন হাবল এসেও এতো সুন্দর করে আমাদের বোঝাতে পারবেন না, যেভাবে জাহেদ বুঝিয়েছে।

জাহেদের লেকচার শেষ হলে এবার এলো বোটানি ডিপার্টমেন্টের ইশরাক। লম্বায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি হবে, ফরসা চেহারা, চোখে চশমা আর ফুলহাতা শার্ট পরে আসছে। দেখলে মনে হয় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কোনো অফিসার।

'জাহেদ অত্যন্ত সুন্দর করে হাবল-বিধি বর্ণনা করে সম্প্রসারণশীল ধারণাকে তুলে ধরল। আমি বিষয়টা অন্যভাবে তুলে ধরব। ডফলার ইফেক্টের মাধ্যমে। তার আগে একটা কার্টুনের কথা বলি, যেটা ডপলার ইফেক্টের ওপর নির্মিত।

আমেরিকার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট সিডনি হ্যারিস (Sydny Harris)-এর একটি কার্টুনে দুজন কাউবয়ের কথা আছে, যারা একটা খোলা জায়গায় ঘোড়ার ওপর বসে আছে। দূরে একটা ট্রেন ছুটে চলছে। তখন একজন আরেকজনকে বলল,

'I love hearing the lonesome wail of the train whistle as the frequency of the wave changes due to the Doppler effect.'

অর্থাৎ, 'আমার এই ট্রেনের বাঁশির নির্জন বিলাপ শুনতে খুব ভালো লাগে যখন এর তীব্রতার মাত্রার পরিবর্তন হয় ডপলার ইফেক্টের জন্য।'

কোনো ট্রেনের বাঁশি জোরে আর তীব্রভাবে তখন শোনা যায় যখন ট্রেনটি আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং এর শব্দের তীব্রতা আস্তে আস্তে কমে যায় যখন ট্রেনটি দূরে চলে যায়।

ক্রিস্টিয়ান ডপলার (Christian Doopler) ১৮৪২ সালে প্রথম ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কোনো চলমান উৎস থেকে আসা তরঙ্গ প্রলম্বিত বা দীর্ঘ হবে যদি উৎসটি আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং তরঙ্গ খাটো বা চাপা হয়ে আসবে যদি উৎসটি আপনার দিকে অগ্রসর হয়।

ডপলার ইফেক্ট অনুযায়ী উৎস (ট্রেন) যখন শ্রোতা (কাউবয়) থেকে দূরে সরে যাবে তখন তা রক্তিম অপসারণ হবে আর উৎস যখন শ্রোতার দিকে চলে আসবে তখন তা নীল অপসারণ হবে।

হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে যখন গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন তখন তিনি লক্ষ করেন, গ্যালাক্সিগুলো ব্লু শিফটেড না হয়ে রেড শিফটেড হয়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলো ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে বা সম্প্রসারিত হচ্ছে। যা পরে তিনি লাল অপসারণ বিধি (Redshifted Rule) তে ব্যাখ্যা করেন।'

এই বলে থামল ইশরাক। আবারও হাততালির রোল উঠল।

এবার সম্প্রসারণ-তত্ত্ব নিয়ে কেমেস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অর্ক বলা শুরু করল, 'আসলে জাহেদ আর ইশরাকের এতো সুন্দর করে সম্প্রসারণ-তত্ত্ব উপস্থাপন করার পর আমার আর কিছু বলার থাকে না। আমি এখন জাহেদের বক্তব্যের হাবলের ১৯২৯ সাল আর ইশরাকের ১৮৪২ সালের ডপলার ইফেক্ট এর মাঝামাঝি সময়কার একটা কথা বলব।

১৯১২ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেস্টো স্লিপার (Vesto Slipher) লক্ষ করলেন যে, গ্যালাক্সিগুলো পৃথিবী থেকে দূরপাল্লায় দূরে সরে যাচ্ছে। পরে অবশ্য ১৯২৯ সালে হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে সেটা প্রমাণ করেন।'

এই বলে অর্ক তার সংক্ষিপ্ত লেকচার শেষ করল। তারপর জনি আর শাওন এসে একই কথা বলল যে, তারা যা আলোচনা করার তা অলরেডি সবাই করে ফেলছে।

শাওন আরজুকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'এবার আরজু কিছু বলো। তুমি তো আবার কুরআন ছাড়া আর কোনো বইকে বিজ্ঞানের বই বলে মনে করো না। গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করলাম আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে আর শেষে তুমি সেটা কুরআন থেকে উপস্থাপন করে দেখালে যে, কুরআনেও থিওরি অফ রিলেটিভিটির কথা আছে। পারলে আজকে বলো, সম্প্রসারণ-তত্ত্বও তোমাদের কুরআনে আছে!'

এই বলে শাওন আর জনি হাসাহাসি শুরু করল।

এতোক্ষণ আরজু নীরব শ্রোতার মতো সবার কাছ থেকে সম্প্রসারণশীল-তত্ত্বের আলোচনা শুনছিল। এবার নীরবতা ভাঙল, তবে শাওনের ব্যঙ্গ কথা গায়ে না মেখে।

'আসলে মিডটার্ম পরীক্ষার কারণে আজকের টপিকটা নিয়ে পড়তে পারিনি।'

আরজু কথা শেষ করতে পারেনি এই সময় জনি বলে উঠল, 'ওহ, তার মানে সম্প্রসারণশীল-তত্ত্ব নিয়ে কুরআনে বলা নাই—এটা বললেই তো হয়।'

আরজু জনির কথাও গায়ে না মেখে বলল, 'আমার মোবাইলে কুরআনের একটা এ্যাপস আছে। প্রতিদিন একবার নটিফিকেশন আসে একটা আয়াত পড়ার জন্য। গতরাতে শুয়ে পড়ব, তখন দেখি নটিফিকেশন এসেছে, Remember Allah Today?

এ্যাপস বের করে দেখলাম পবিত্র কুরআনের সূরা যারিয়াতের ৪৭ নাম্বার আয়াত।

'And the heaven we constructed with strength, and indeed we are it's expander.' অর্থাৎ, আকাশ নির্মাণ করেছি আমাদের ক্ষমতাবলে এবং আমরা অবশ্যই একে সম্প্রসারণ করছি।

এখানে আরবী শব্দ 'লামুসীয়ূন' ব্যবহৃত হয়েছে সম্প্রসারণ বোঝাতে। বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে কাসির এবং কুরতুবী 'লামুসীয়ূন' এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সম্প্রসারণকারী' অর্থটি বেছে নিয়েছেন।

তোমাদের এই দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ এই ছোট্ট আয়াতেই তো আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, মহাবিশ্বকে আল্লাহ সম্প্রসারণ করেন।

আধুনিক বিজ্ঞান যেটা প্রমাণিত করার ১০০ বছরও হয়নি অথচ কুরআন যাকে কেউ কেউ মধ্যযুগীয় কিতাব বলে অবজ্ঞা করে (শাওন আর জনির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে) সেটা বলেছে ওই মধ্যযুগেই।'

আরজুর কথা শুনে জনি আর শাওন পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করল আর জাহেদ, ইশরাক, অর্ক মুচকি হাসল।

আলোচনা করতে গিয়ে খেয়ালই ছিল না যে, কীভাবে মাগরিবের নামাজের জামাত শেষ হয়ে গেছে। বসা থেকে উঠে আমি, আরজু, অর্ক, জাহেদ আর ইশরাক শহীদুল্লাহ হলের মসজিদে নামাজ পড়তে গেলাম।

আরজু ইমাম হয়ে জামাতে নামাজ পড়াল, আমরা বাকিরা মুসল্লি হয়ে নামাজ পড়লাম।

আরজু সূরা যারিয়াতের ওই আয়াত থেকে তেলাওয়াত শুরু করল একটু আগে যা সম্প্রসারণশীল-তত্ত্বের আলোচনায় বলেছিল।

ইবলিস জিন, নাকি ফেরেশতা?

আমাদের বন্ধু সোহান স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। সোহানের স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকায় চলে যাওয়ায় আমরা যত না খুশি তার চেয়েও বেশি মনখারাপ; কারণ, আমরা যে চারজন বন্ধু বেশিরভাগ সময় একসাথে থাকতাম তার মধ্যে সোহান ছিল একজন। আমেরিকায় চলে যাবার আগে আমাদের সবাইকে ট্রিট দিতে নিয়ে গেল স্টার কাবাবে।

আমি, সোহান, সায়েম, মাহির আর আরজু বসে আছি রেস্টুরেন্টে। আরজুকে বেশি মনমরা দেখাচ্ছে; কারণ, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আরজুর মতো ধর্মীয় ব্যাপারে আগ্রহ ছিল একমাত্র সোহানের। অনেক সময় ঝড়-বাদলের দিনে সোহান ছুটে আসত আরজুর কাছে। এমন কোনোদিন দেখিনি—যে-দিন আরজুর সাথে সোহানের দেখা হয়েছে আর সোহান ধর্মীয় কোনো ব্যাপার নিয়ে আরজুর সাথে কথা বলেনি। যার ফলে আরজু আর সোহানের মধ্যে আলাদা একটা সম্পর্ক আছে।

ওয়েটার এলে আমরা খাবারের অর্ডার দিই। খাবার নিয়ে আসার ফাঁকে সোহান বরাবরের মতো আজও আরজুকে প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা আরজু, প্রশ্নটা এর আগে আমার মাথায় আসেনি, সেদিন দেখলাম ফেসবুক গ্রুপে একজন স্ট্যাটাস দিয়েছে যে, কুরআনে একবার বলা হয়েছে ইবলিস শয়তান হলো ফেরেশতা আর আরেকবার বলা হয়েছে ইবলিস শয়তান হলো জিন। ওই লোক এই রেফারেন্স দেখিয়ে বলল, এটা তো পরস্পরবিরোধী আয়াত। কোনোভাবেই আমি এর উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। আসলেই এটা কি পরস্পরবিরোধী আয়াত?’

অন্য কোনো সময় হলে হয়তো আরজুর এই সব ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর শোনার আগ্রহ থাকত না; কিন্তু এই প্রশ্ন যে আমার নিজের মাথায়ও ঘুরপাক খাচ্ছে! সায়েমের সাথে কথা বলা থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম আরজুর দিকে। দেখলাম, শুধু আমি না, সবাই আরজুর দিকে তাকিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায় আছে। আমাদের সবার এরকম 'সিরিয়াস' মুখভঙ্গি দেখে আরজু হেসে ফেলল।

ভেবেছিলাম, হয়তো সোজাসাপটা উত্তর বলে দেবে আরজু। তা না করে সে সোহানকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুই যেন কোন কলেজে স্কলারশিপ পেয়েছিস?'

সোহান একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে, আমি তোকে কী জিজ্ঞেস করছি আর তুই কী বলছিস?'

'আরে, বল না।'

'পমনা কলেজে (Pomona College)।'

এবার আরজুর মধ্যে একটা সিরিয়াস ভাব চলে এলো; তার মানে, একটা ছোটখাটো বক্তৃতা শুরু করবে এবার।

'আচ্ছা ধর, তুই কলেজে ভর্তি হয়ে ওখানকার লেকচার, ওখানকার কালচার, ওখানকার খাবারদাবার—কিছুর সাথেই মানিয়ে নিতে পারলি না। শেষে দেখা গেল, তুই ফার্স্ট সেমিস্টারে ফেইল করলি, অথচ তোর ক্লাসের সবাই পাস করল। এরকম হতে পারে না?'

সোহান মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, হতে পারে।'

'ধরে নিলাম, যারা পাস করেছে সবাই আমেরিকান। তুই ও যেহেতু ওই দেশের নাগরিক হয়ে গেছিস, তাই ধরে নিলাম, তুইও আমেরিকান। এখন যদি বলা হয় 'সব আমেরিকান পাস করেছে কেবলমাত্র সোহান বাদে' এই কথা কি ভুল হবে?'

'না, ভুল হবে কেন? ঠিকই তো আছে।'

'আবার যদি বলা হয়, 'সব আমেরিকান পাস করছে কেবল সোহান বাদে, সে ছিল বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বা বাঙালি' এই কথা কি ভুল হবে?'

সোহান আবার মাথা নেড়ে বলল, 'না, ঠিকই তো আছে; কিন্তু ইবলিসের উদাহরণ দিতে গিয়ে আমার উদাহরণ দিচ্ছিস কেন?'

সোহানের হাস্যকর প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই হাসলাম, সোহান নিজেও হাসল।

হাসি থামিয়ে আরজু বলল, 'এবার আসি তোর প্রশ্নে। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

আমি যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, 'তোমরা আদমকে সেজদা করো' তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল।[১] এখানে আল্লাহ বলেছেন ফেরেশতাদের সেজদা করতে বললে ইবলিশ ছাড়া সবাই সেজদা করল। আরবী ব্যাকরণে 'তাগলীব' নামে একটা ব্যাপার আছে। এর মানে হলো, যদি majority কে সম্বোধন করা হয় তবে minority ও এতে সাড়া দেবে। যেমন—যখন বলা হয়েছিল 'সব আমেরিকানরা পাস করেছে কেবলমাত্র সোহান বাদে' এখানে তোকে আলাদাভাবে বাঙালি বলার দরকার হয়নি। ঠিক তেমনই কুরআনে আল্লাহ ফেরেশতাদের সিজদা করতে বলেন, ইবলিসকে আলাদাভাবে জিন সম্বোধন করে বলেননি 'সেজদা করো'।

এবার চুপচাপ বসে থাকা মাহির জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি ইবলিস জিন?'

'এর উত্তর আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম 'আদমকে সিজদা করো' তখন সবাই সিজদা করল ইবলিস বাদে। সে ছিল জিনদের একজন।[২] এখানে আল্লাহ স্পষ্টই বলেছেন, ইবলিস ছিল জিন। তাছাড়া ইবলিশ কীভাবে জিন থেকে ফেরেশতার মর্যাদা পায় সেটা নিয়ে রয়েছে বিশাল ইতিহাস।'

কথা বলার মাঝখানে ওয়েটার টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। আরজু বলল, 'আচ্ছা থাক! সেই ইতিহাস না-হয় আরেকদিন বলব।'

আরজুর দিকে ভালোবাসামিশ্রিত রাগে তাকিয়ে সোহান বলল, 'আমি চলে যাবার পর তুই বলবি? খেতে খেতে বল...'

কাবাবে এক কামড় দিয়ে আরজু বলল, 'পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৪

[২] সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫০

জিন সৃষ্টি করেছেন। ইবলিস ছিল সেই জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তখন জিনেরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করত যেমনটা আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে মানুষ সৃষ্টির কথা বললে তারা ধারণা করে মানুষেরা জিনদের মতো পৃথিবীতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা করবে। তাই তারা বলল, 'আপনি কি এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন যারা রক্তপাত ঘটাবে?'[১] কিন্তু ইবলিস ছিল আল্লাহর বাধ্য এবং ধার্মিক জিন। সে এরকম বিশৃঙ্খলায় জড়ায়নি। আস্তে আস্তে সে ফেরেশতাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে জ্ঞানার্জন করতে থাকে এবং সে ফেরেশতাদের মতো ইবাদত করতে থাকে। এভাবে একসময় দেখা যায় সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়। তখন তার নাম ছিল 'আযাযিল'। তাই সে জেনেটিক্যালি জিন হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতার মর্যাদা পায়।'

আরজুর কথা শেষ হলে আমি আরও কিছু যোগ করে বললাম, 'তাছাড়া ফেরেশতারা তো নূরের তৈরি আর জিন ছিল আগুনের তৈরি।'

আরজু বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, যেমন, আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে যখন আল্লাহ বলেন তখন ইবলিস এই অহংকারে সিজদা করেনি যে, সে ছিল আগুনের তৈরি আর আদম মাটির।[২] যেহেতু সে ছিল আগুনের তৈরি তাহলে স্পষ্টত সে ছিল জিন। তাছাড়া ফেরেশতাদের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই, তারা আল্লাহর নির্দেশ মানতে বাধ্য; কিন্তু ইবলিস যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে সেহেতু তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ছিল। যা কেবল মানুষ আর জিনের আছে।'

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১২

কাবাঘরে মাদার মেরির ছবি!

ফেসবুকে ঢুকলে আর বের হতে ইচ্ছে করে না। এটা একটা নেশার জগৎ। মাঝে মাঝে এমনও হয়, ডিপার্টমেন্টের নোটিশ দেখার জন্য ফেসবুকে ঢুকলাম; কিন্তু ঘণ্টা দু'য়েক ফেসবুক চালানোর পরে মনে হয়, আরে, আমি তো এখনও ডিপার্টমেন্টের নোটিশই দেখিনি!

ফেসবুকে ঢোকার নেশা কাটাতে আরজু নতুন একটা আইডিয়া উদ্ভাবন করেছে। যেটা আমারও মনে ধরেছে।

আরজু বলে, যখনই মন চাইবে ফেসবুকে ঢুকতে, তখন হুমায়ূন আহমেদের বই পড়া শুরু করবি। হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের মধ্যে মজে থাকার নেশা অন্তত কিছু হলেও কাজে আসবে।

পাশাপাশি অবশ্য আরজু সতর্কও করে দেয়, এই সব বই পড়তে গিয়ে ধর্মীয় ইস্যু আসলে সেটা ভালোমতো যাচাই-বাছাই করে নিতে।

মোবাইলে একটা এ্যাপ ইন্সটল করেছিলাম, এ্যাপটিতে হুমায়ূন আহমেদের সবগুলো বই আছে। যখন সাথে বই থাকে না তখন এ্যাপটা ওপেন করে বই পড়ি।

এই মুহূর্তে মোবাইলে বই পড়তে ইচ্ছা করছে না। টেবিলের ওপর দেখলাম হুমায়ূন আহমেদের একটা বই, হিজিবিজি। আরজুর বইগুলো পড়ার পারমিশন আমার আছে। বইয়ের পাতা উল্টালাম।

আরজুর অভ্যাস হলো, একটা বই কেনার পর বই কেনার স্মৃতি বইয়ের প্রথম পাতায় লিখে রাখে।

বইয়ের ভেতরে একটা ভাজ করা কাগজ দেখতে পেলাম। আরজু পাশে ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কীসের কাগজ? কনফিডেন্সিয়াল কি না?

'না, গোপনীয় কিছু না। ওই পৃষ্ঠায় হুমায়ূন আহমেদের একটি লেখার সাথে আমি দ্বি-মত পোষণ করেছি। আমার দ্বি-মত পোষণের পেছনে আর্গুমেন্টসগুলো কী কী সেগুলো লিখে রেখেছি। চাইলে পড়তে পারিস।'

কাগজটা হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলাম।

'আমার বই পড়ার হাতেখড়ি হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ে। নীলক্ষেতে এখন বই কিনতে গেলে বেশ সময় নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের অপঠিত বইগুলো খুঁজতে হয়। এই লেখকের লেখাগুলো পাঠককে জাদুর মতো আকর্ষণ করে, আমাকেও করেছে।

তবে লেখকের সকল বক্তব্যের সাথে আমি সহমত পোষণ করতে পারি না। যেসব বক্তব্যের সাথে দ্বি-মত পোষণ করি সেগুলোকে আমার ল্যাবরেটরিতে পাঠাই। লেখাগুলোর ভালোমতো অস্ত্রোপচার করে তারপর নিজের মন্তব্য লিখি, কেন আমি দ্বি-মত পোষণ করলাম।

হিজিবিজি বইয়েরও একটা লেখার সাথে আমি দ্বি-মত পোষণ করেছি। লেখাটির শিরোনাম হলো 'এখন কোথায় যাব, কার কাছে যাব?'

এই বইয়ে লেখাটি প্রকাশের আগেও একই লেখা প্রকাশিত হয়েছিল *প্রথম আলো* পত্রিকায়, ২৭ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে। লেখাটি প্রকাশের পর দেশের যুগ-সচেতন আলেমসমাজ হুমায়ূন আহমেদের এই লেখাটির সমালোচনা করেন।

যে-কারণে লেখাটির সাথে আমি দ্বি-মত পোষণ করলাম—

হিজিবিজি বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠায় 'এখন কোথায় যাব, কার কাছে যাব?' শিরোনামে লেখা কাবাঘরে মাদার মেরির ছবি অপসারণ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনীহা প্রকাশের কাহিনি নামে এক তথ্য লেখক উদ্ধৃত করেছেন।

লেখাটি পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে একে অপারেশন থিয়েটারে পাঠাতে হবে। লেখাটি বিভিন্ন সোর্স থেকে যাচাই করে দেখলাম যে, এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে এক জঘন্য মিথ্যাচার।

হুমায়ূন আহমেদ বইটিতে যা উল্লেখ করেন তা হলো—'আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের ৩৬০টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেওয়ালের সব ফ্রেসকো নষ্ট করার কথাও তিনি বললেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল কাবার মাঝখানের একটি স্তম্ভে, যেখানে বাইজেন্টাইন যুগের মাদার মেরির একটি অপূর্ব ছবি আঁকা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে হাত রাখলেন এবং বললেন, 'এই ছবি তোমরা নষ্ট করো না।' কাজটি তিনি করলেন সৌন্দর্যের প্রতি তার অসীম মমতা থেকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরেও ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগে কাবা শরীফের মতো পবিত্র স্থানে এই ছবি ছিল, এতে কাবা শরিফের পবিত্রতা ও শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাকের[১] লেখা *দি লাইফ অব মোহাম্মাদ* গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বললাম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বইটি অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম যেটির প্রকাশকাল ২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫২।

রেফারেন্স হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী নিয়ে ইবনে ইসহাকের লেখা গ্রন্থ থেকে—যা অনুবাদ করেন আলফ্রেড গিয়োম ১৯৫৫ সালে।

আদতে আলফ্রেড গিয়োম ইবনে ইসহাকের গ্রন্থ থেকে তার *Life of Muhammad* গ্রন্থটি সংকলন করেননি!

ইবনে ইসহাকের লেখা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীগ্রন্থটি নষ্ট হয়ে যায়, পরে তার ছাত্র 'যিয়াদ আল বাক্কানী' সেগুলো সম্পাদনা করেন, দুর্ভাগ্যবশত সেগুলোও নষ্ট হয়ে গেলে বাক্কানীর ছাত্র ইবনে হিশাম সেগুলো সম্পাদনা করেন এবং ইবনে ইসহাকের ভিত্তিহীন তথ্যগুলো বাদ দেন। ভিত্তিহীন

---

[১] আরব ইতিহাসবিদ, জন্ম : ৭০৪ খ্রিস্টাব্দ, মদীনা, মৃত্যু : ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ, বাগদাদ

তথ্য বলতে যেগুলোর সনদ সহীহ নয় এবং তাদলীসের[১] প্রবণতা আছে।

ইবনে হিশামের সিরাতগ্রন্থ এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আলফ্রেড গিয়োম মূলত ইবনে হিশামের সিরাতগ্রন্থ থেকে তার বইটি লেখেন; কিন্তু বইয়ের প্রচ্ছদে ইবনে ইসহাকের সংকলন বলে উল্লেখ করেন। তার কারণ, ইবনে হিশাম থেকে যেসব বর্ণনা ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত সেগুলোই কেবল তিনি তার *Life of Muhammad* গ্রন্থে সংকলন করেন।

হুমায়ূন আহমেদ যে রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন সেই মূল সোর্স খুঁজতে গেলাম।

আলফ্রেড গিয়োম তার গ্রন্থের ৫৫২ পৃষ্ঠায় যা উল্লেখ করেন তা হলো :

> Ibn Ishaq From Hakim b.`Abbad b. Hanif and other traditionists reported that : Quraysh had put picturers in the Ka'ba including two of Jesus son of Mary and Mary (on both of whom be peace!)
>
> Ibn Shihab said : Asma' b. Shaqr said that a woman of Ghassan joined in the pilgrimage of the Arabs and when she saw the picture of Mary in the Ka'ba she said, `My father and my mother be your ransom! You are surely an Arab woman!' The apostle ordered that the pictures should be erased except those of Jesus and Mary.

এতোটুকু লেখা শেষে আলফ্রেড গিয়োম ফুটনোটে লিখেছেন—

> Apparently I.H. has cut out what I.I wrote and adopted the later tradition that all the pictures were obliterated. A more detailed account of these pictures will be found in Azr. 104-6

---

[১] তাদলীস শব্দটি 'উলূমে হাদীসে'র একটি পরিভাষা। হাদীসের কোনো বর্ণনাকারী যখন হাদীস বর্ণনা করার সময় তার নিজের উসতাজের নাম উল্লেখ না করে উপরস্থ কোনো উসতাজের নাম উল্লেখ করেন, অথচ তিনি নিজে তার থেকে হাদীসটি শোনেননি, তখন ওই হাদীসের ক্ষেত্রে 'তাদলীস' শব্দটি ব্যবহার করা হয় যে, অমুক এই হাদীস বর্ণনার সময় তাদলীস করেছেন। যার থেকে তাদলীস প্রমাণিত হয় তাকে মুদাল্লিস এবং যে হাদীসটি তাদলীসসহ বর্ণিত হয় সে হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়।

হুমায়ূন আহমেদ আলফ্রেড গিয়োমের ফুটনোটের কথা উল্লেখ করে বলেননি যে, এই তথ্য ভিত্তিহীন হওয়ায় ইবনে হিশাম এটা বাদ দিয়েছেন।

উল্টো তিনি এমন কথা সংযুক্ত করলেন 'কাজটি তিনি করলেন সৌন্দর্যের প্রতি তার অসীম মমতা থেকে।' এই কথা ইবনে ইসহাক কিংবা আলফ্রেড গিয়োম কেউই বলেননি, হুমায়ূন আহমেদ নিজ থেকে বানিয়ে কথাটি বলেছেন।

আলফ্রেড গিয়োম যা উল্লেখ করেছেন তা ইবনে ইসহাক থেকে নয়; বরং আযরাকীর *আখবারু মক্কা* নামক গ্রন্থ থেকে।

এখন প্রশ্ন জাগে, আযরাকী কে ছিলেন?

আযরাকী ইবনে ইসহাকের ছাত্রও ছিলেন না এমনকি কোনো নির্ভরযোগ্য রাবী ও ছিলেন না। *বুখারী, মুসলিম* কিংবা সিহাহ সিত্তার কোনোগ্রন্থেই আযরাকীর কোনো বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি।

তার গ্রন্থ *আখবারু মক্কায়* ইবনে শিহাবের বর্ণনায় যে-কাহিনি বলা হয়েছে সেটাও ইবনে শিহাব বলেছেন কোনো সূত্র ছাড়া। অর্থাৎ তাদলীসের প্রবণতা বা মাঝখানের সূত্রের অনুপস্থিতি।

যেখানে ইবনে শিহাবের জন্ম ৫০ হিজরীতে এবং মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরীতে; সেখানে কীভাবে ইবনে শিহাব কোনো সূত্র ছাড়া সেই কাহিনি এমনভাবে বর্ণনা করেন— যা দেখে মনে হয় তিনি নিজেই তখন উপস্থিত ছিলেন যখন কাবাঘরে মূর্তি ভাঙা হয়!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-কাবাঘরের মূর্তিভাঙার আগে এবং ছবি অপসারণ করার আগে প্রবেশ করেননি সেই সংক্রান্ত সহীহ হাদীসগুলো দেখে নেওয়া যাক :

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় এলেন, তখন কাবাঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা, কাবাঘরের ভেতরে মূর্তি ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং মূর্তিগুলো বের করে ফেলা হলো। একপর্যায়ে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামের প্রতিকৃতিও বের করে আনা হয়। তাদের উভয়ের হাতে জুয়া খেলার তির ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ!

মুশরিকদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তারা জানে যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম তির দিয়ে অংশ নির্ধারণের ভাগ্য পরীক্ষা কখনও করেননি। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরের চারদিকে তাকবীর বলেন; কিন্তু ঘরের ভেতরে সালাত আদায় করেননি।[১]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল-বাতহা' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দিলেন—যেন তিনি কাবার ভেতরে গিয়ে এর মধ্যে বিদ্যমান সব ছবি সরিয়ে ফেলেন। । অতঃপর সব ছবি সরিয়ে ফেলার পূর্বপর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করেননি।[২]

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে কাবাঘর খোলা হয়। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি অনেকগুলো ছবি দেখলেন। এসব ছবির মধ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ছবিও ছিল। তাদের হাতে ছিল ভাগ্য গণনার তির। এ দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ, এ দুজন নবী কখনই ভাগ্য গণনার তির ব্যবহার করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের ভেতর কাঠের তৈরি একটি কবুতরও দেখতে পান। তিনি নিজহাতে সেটি ভেঙে ফেলেন। তার নির্দেশে ছবিগুলো মুছে ফেলা হয়।'[৩]

ছবির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা—'যে-ঘরে ছবি থাকে, সে-ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[৪]

আবুল হাইয়্যাজ আল আসাদী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন—

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কি তোমাকে এমনভাবে পাঠাব না, যে-কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে কোনো

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১৬০১

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪১৫৬

[৩] *আর রাহীকুল মাখতুম* : আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, পৃষ্ঠা ৪৩৮ (৩২ তম সংস্করণ)

[৪] *সহীহ বুখারী* : ২১০৫

জীবের প্রতিকৃতি বা ছবি দেখলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখলে তা ভেঙে দেবে।[১]

অন্য বর্ণনায় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জানাযায় (মদীনার বাইরে) বের হলেন, তিনি বললেন—তোমাদের মধ্যে কে আছ মদীনার অভ্যন্তরে গিয়ে যত মূর্তি পাবে সব বিচূর্ণ করবে, যত কবর দেখবে সব সমান করে দেবে এবং যত ছবি পাবে সব মুছে নষ্ট করে দেবে। তখন একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাব; কিন্তু মদীনাবাসীকে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও। তখন আলী চলে গেলেন। পরে ফিরে এসে বললেন, আমি সব মূর্তি ভেঙে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি কেউ পুনরায় এ সকল কাজের কোনো একটি করে তাহলে সে মুহাম্মাদের ওপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফরী করল।[২]

ছবির বেলায় যদি ইসলামের এমন নির্দেশনা থাকে, তাহলে এ কথা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কাবাঘরে মাদার মেরির ছবি রেখেছিলেন? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এমনটা করতেন, তাহলে সাহাবীগণ অন্তত কৌতূহলবশত এর কারণ জানতে চাইত; কিন্তু ইতিহাসগ্রন্থে আমরা এমনটা দেখতে পাই না।

নোটের এতোটুকু পড়ার পর আরজু সেটা তার কাছে নিয়ে নিল।

আমাকে বলল, 'বইয়ের লেখাটা পড়ার জন্য নোটের এই অংশটুকু পড়াই যথেষ্ট। বাকি অংশটা লেখক সম্পর্কে আমার অভিমত। সেটা পড়ে তোর লাভ নাই।'

---

[১] *মুসনাদে আহমদ* : ৬২২

[২] *সহীহ বুখারি* : ১১০

আরজু সহজে কোনোকিছুতে 'না' বলে না। আর একবার 'না' বললে কখনও সেই না বলা 'হ্যাঁ' হয় না।

নোটের শেষ অংশ না পড়ে বইটি পড়া শুরু করলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই সব লেখাগুলো পড়তে একটু সতর্ক হতে হবে। প্রয়োজনে 'টীকা'র সন্ধান করা লাগবে।

‘সরি’ বনাম ‘আলহামদু লিল্লাহ’

ক্লাসের প্রথম সারিতে বসার জন্য ক্লাস শুরুর আগেই ক্লাসে চলে যাই। আজ সকালে বৃষ্টি ছিল তাই দেরিতে গিয়েও দেখি সামনের সিট ফাঁকা। আমি আর আরজু বসলাম। একটু পর স্যার আসলেন। আজকের টপিক ছিল Statistics এর Central Tendency.

স্যার পড়ানো শুরু করলেন। বৃষ্টিতে ভিজে আমরা ক্লাসে গেলাম আর ক্লাসের এসিটাও অন রাখা তাই আরজুর ঠান্ডা লাগছে হয়তো। আরজু এতো জোরে হাঁচি দিল যে, আরজুর হাঁচি শুনে পুরো ক্লাস নীরব হয়ে গেল। হাঁচি দেবার পর আরজু যখন আস্তে করে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলল, নীরব ক্লাসে সেই আস্তে বলা কথাটাও মনে হলো ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসে থাকা পাবেল আর রিয়াজরা শুনতে পেল।

স্যার বললেন, ‘What you said?’

আরজু বলল, ‘Sir, I said Alhamdu lillah.’

স্যার হেসে বললেন, ‘তোমরা তো আবার হাঁচি দিলে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলো। শুনলাম তোমাদের আল্লাহ নাকি হাঁচি দিলে খুশি হোন আর হাই তুললে কষ্ট পান।’

আরজু বলল, ‘আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন আর হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।’[১]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬২২৬

আরজুর কথা শুনে স্যার হেসে গড়িয়ে পড়েন অবস্থা। স্বাভাবিক হবার পর বললেন, Listen my dear son and daughter! আমরা কোনো একটা মিটিং এ কিংবা কারও সাথে কথা বলার সময় কেউ যদি হাঁচি দেয় তাহলে ভদ্রতার খাতিরে তখন কী বলে?

ক্লাসের কয়েকজন বুদ্ধিমান ছাত্র(!) বলল, 'Sorry বলে।'

স্যার হেসে বললেন, 'তবে কী আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিমরা হাঁচি দিলে ভদ্রতার লেশমাত্র ছোঁয় না; বরং তারা সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে।'

এটা বলে হো হো করে হাসতে থাকলেন স্যার।

আরজু দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, বিজ্ঞান যদি বলত যে, হাঁচি দেবার পর আমাদের উচিত নিজেদের ভাগ্যবান মনে করা তখন আপনি কী বলতেন?'

স্যার বিদ্রুপ করে বললেন, 'বিজ্ঞানীদের এতো মাথাখারাপ হয়নি যে, তারা বলবে, হাঁচি দেবার পর নিজেদের ভাগ্যবান মনে করা।'

'স্যার, হাঁচিকে ইংরেজিতে Sneeze বলা হয়। আমাদের নাকে যদি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ঢোকে, তাহলে সেখান থেকে আমাদের ব্রেইনের স্নিজিং সেন্টারে সিগন্যাল যায়। তখন সেখান থেকে যে রি-অ্যাকশান আসে, তার কারণে আমাদের চোখ, মুখ এবং শ্বাসনালীর কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বুকের পেশিগুলো খুব জোরে সংকুচিত হয় এবং কপাটিকা খুলে যায়। অবশেষে বাতাস, থুথু এবং মিউকাস আমাদের মুখ এবং নাক থেকে প্রচণ্ড জোরে বের হয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা হাঁচি বলে জানি। এই রিফ্লেক্সের কারণে আমাদের দেহ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এই বাতাস বের হবার রাস্তা যদি না থাকত, তাহলে আমাদের কানের পর্দা ফেটে যেতে পারত। আমাদের দেহের এই সমস্ত ব্যবস্থা আল্লাহ তৈরি করে দিয়ে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। এজন্য হাঁচি দিলে আমরা মুসলিমরা আল্লাহর প্রশংসাস্বরূপ 'আলহামদু লিল্লাহ' বলি।'

পুরো ক্লাস নীরব। সবাই আরজুর কথা মন দিয়ে শুনছে। উত্তরটা পেয়ে মনে হলো স্যার সন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু পরক্ষণে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে হাই তোলা আল্লাহ অপছন্দ করেন কেন?'

আরজু হেসে বলল, 'হাই তোলার বিভিন্ন কারণ আছে। তার মধ্যে কেউ যদি ক্লান্ত না থেকে ঘনঘন হাই তোলে সেটা হয়তো লিভার সমস্যার সিম্পটম হতে পারে।

আবার অনেক সময় আমাদের শরীর দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন ঘনঘন হাই উঠতে পারে। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় Thermoregulatory dysfunction বলে। এছাড়াও ঘনঘন হাই তোলা মৃগীরোগেরও লক্ষণ।'

আরজুর কথা শেষ হলে স্যার আবার প্রশ্ন করেন, 'তাহলে আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের কী আছে?'

'আছে স্যার। কারণ, আল্লাহ তার বান্দাদের ভালোবাসেন। তিনি জানেন, কীসে তার বান্দার ভালো হবে আর কীসে খারাপ হবে। এজন্য তো আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ আর হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।'

বৃষ্টিতে ভিজে আসার কারণে স্যারও ক্লাস শেষের আগ মুহূর্তে হাঁচি দিলেন। হাঁচি দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। স্যারের মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো স্যারের মন বলছে হয়তো 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতে; কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তর্কে হারার জন্য লজ্জায় হয়তো বলতে পারছেন না।

কুরআনের ঐতিহাসিক ভুল!

ক্লাস থেকে ফেরার পথে জাফর ভাই আমাকে একটা লিফলেট দিলেন, হলুদ কালারের লিফলেট। লিফলেটটা পকেটে ভাঁজ করে রুমে নিয়ে এলাম। পড়ার টেবিলে লিফলেট আর কলম রাখলাম। আরজু শুয়ে বই পড়ছে, আল্লামা তাকী উসমানীর *খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ।* একমনে পড়ে যাচ্ছে, আমি যে রুমে ঢুকেছি সেটাও হয়তো বুঝতে পারেনি। তাকে আর ডিস্টার্ব না করে টিউশনি করাতে চলে গেলাম।

ফেরার পথে দেখি হলের সামনে গণ্ডগোল হচ্ছে। জাফর ভাই আর পরিচিত কয়েকজনকে দেখলাম কোনো একটা বিষয় নিয়ে রাগারাগি করছে। হয়তোবা কিছুক্ষণ আগে হাতাহাতিও হয়েছিল। কয়েকজন হল-টিউটরও এসেছেন। আশেপাশের কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে? কেউ কিছু বলছে না।'

রুমে ঢুকে দেখলাম আরজু ফোনে কথা বলছে। ক্রমাগত 'আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার' বলেই যাচ্ছে। আমাকে দেখে আরজু বলল, 'এই লিফলেট আমাকে ডেনিয়েল দিয়েছে কি না?'

আমি বললাম, 'না, জাফর ভাই দিয়েছেন।'

মাগরিবের নামাজ পড়ে ফেসবুকে ঢুকে বুঝলাম বিকেলের গণ্ডগোলটা আসলে কেন হয়েছে। জাফর ভাই এবং আরও কয়েকজন মিলে ক্যাম্পাসে লিফলেট বিলিয়ে বেড়াচ্ছে। লিফলেটের শিরোনাম, 'কুরআনের ঐতিহাসিক ভুল'। আমাদের হলের কয়েকজন ভাইকে এই লিফলেট দিতে গিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়,

একপর্যায়ে হাতাহাতিও হয়। পরে হল-টিউটররা এসে পরিস্থিতি সামলান এবং বিষয়টা দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

ফেসবুকে বিষয়টা ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই জাফর ভাই এবং তাদের গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গ করে লেখালেখি করছে। তাদের কার্যক্রমের বিরোধিতা করছে। কেউ কেউ আবার বলছে, তাদের কত্ত বড় স্পর্ধা—কুরআনের ভুল ধরছে এবং তাও আবার প্রচার করে বেড়াচ্ছে?

জাফর ভাইদের কার্যক্রম দেখে আমারও একটু রাগ হলো। আরজুকে বিষয়টা বললাম, তখন দেখি আরজু ল্যাপটপে Holy Bible পড়ছে। আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলল, তোর না আজকের মধ্যে ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহর *Alchemy of Happiness* বইটা পড়ে শেষ করার কথা?

কাকে কী বোঝাই? আমি গেলাম এই ধর্মীয় অপপ্রচার রোধে কিছু একটা করার জন্য তাকে বোঝাতে, আর সে আমাকে *Alchemy of Happiness* পড়ে শেষ করার রিমাইন্ডার দিচ্ছে! আরজুর ওপর খানিক বিরক্ত হয়ে ফেসবুকে ঢুকলাম।

নিউজফিড স্ক্রল করতে গিয়ে দেখি একটা ইভেন্ট। বিতর্ক : কুরআনে কি ঐতিহাসিক ভুল আছে?

শুক্রবারে বিকেল ৩ টায় টিএসসির অডিটোরিয়ামে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। ইভেন্টে রেজিস্ট্রেশন করলাম। আরজুকে দেখালাম, এই বিষয় নিয়ে পুরো ক্যাম্পাস উত্তাল, শুক্রবারে বিতর্ক অনুষ্ঠান হবে, আর তুই কিনা এদিকে কর্ণপাত না করে Holy Bible নিয়ে পড়ে আছিস!

আরজু আমার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে হাসি উপহার দিল, এই হাসি আমার গায়ে কাঁটার মতো বিঁধল। কথা না বলে রুম থেকে বের হয়ে গেলাম। শুক্রবারে সময়ের অনেক আগেই টিএসসির অডিটোরিয়ামে চলে গেলাম। অন্য সময় হলে আরজুকে নিয়ে আসতাম, এই বিষয় নিয়ে সে মোটেও কর্ণপাত করছে না দেখে তার সাথে কথা না বলেই চলে এসেছি। বিতর্ক শুরু হবার আর ৫ মিনিট বাকি। অডিটোরিয়াম একেবারে লোকারণ্য। অনেকেই সিট না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম সারিতে ভার্সিটির স্বনামধন্য কয়েকজন শিক্ষককেও দেখা যাচ্ছে। বিচারক হিসেবে আছেন বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক আশরাফুজ্জামান স্যার,

জোসেফ আড্রিয়ান স্যার, ইতিহাস বিভাগের রণজিৎ বিশ্বাস স্যার। বিতর্কের পক্ষে অবস্থান করছে ডেনিয়েল। তার পাশে দেখলাম জাফর ভাই এবং আরও কয়েকজন ডেনিয়েলের সাথে কথা বলছেন। সবাই একই দলভুক্ত। নামগুলো শুধু 'ইসলামী'।

হঠাৎ দেখলাম আরজু স্রোতের মতো পাশ কাটিয়ে আসছে। ক্রমে স্টেজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্টেজে গিয়ে স্যারদের সালাম করে বিতর্কের বিপক্ষের আসনটিতে বসল। One to one debate.

তার মানে সেদিন রাতে 'আচ্ছা আচ্ছা' বলে কোনো স্যারের সাথে এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলছিল সে, অথচ আমি ভুল বুঝে ভাবছিলাম, এই বিষয়ে সে কর্ণপাতই করছে না। মঞ্চ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল আরজু। আজকের এই হাসি ওই দিনের মতো মনে হচ্ছে না, ভালোই লাগছে। আমিও আরজুর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বিতর্ক শুরু হলো। প্রথমে ডেনিয়েল তার পক্ষের আর্গুমেন্টসগুলো দেখানোর চেষ্টা করল।

'আজকের বিতর্ক মূলত কুরআনের ঐতিহাসিক ভুল নিয়ে। আমি সেটা প্রমাণ করে যাব। কুরআনে বর্ণিত 'হামান' নামক ব্যক্তিটিকে বলা হয়েছে মিসরের ফেরাউনের কেবিনেটের একজন মন্ত্রী এবং ইট পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত। অথচ পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে হামান নামক লোকটি পারস্যের রাজা অহেশ্বরসের একজন মন্ত্রী।'

এই বলে ডেনিয়েল বাইবেলের Book of Esther থেকে হামানের কাহিনি বর্ণনা করল।

'রাজা অহেশ্বরসের হামানকে মন্ত্রীপরিষদের সর্বোচ্চ পদে বসালেন। সবাই হামানকে সম্মান করল; কিন্তু মর্দখই (Mordecai) তাকে সম্মান করল না। হামান যখন জানতে পারল মর্দখই ইহুদী তখন সে মর্দখই-সহ অহেশ্বরসের রাজত্বের সকল ইহুদীকে হত্যা করতে চাইল। মর্দখই বিষয়টি রানী ইস্টারকে বললেন। রাণী মর্দখইকে আশ্বাস দিলেন এবং ইহুদীদেরকে ৩ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। পরে ইস্টার রাজাকে বলেন, তার একটা অনুরোধ রাখার জন্য। রাজা অহেশ্বরস বলেন, রাণী চাইলে তিনি তার সমস্ত রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেবেন, তিনি বলুন তিনি কী চান।

রাণী ইস্টার রাজাকে বললেন, হামান ইহুদীদেরকে মেরে ফেলতে চায়। ইহুদীদেরকে হামানের হাত থেকে বাঁচাতে রাণী ইস্টার রাজার কাছে অনুরোধ করেন। রাণীর কথা শুনে রাজা অনুরোধ মঞ্জুর করেন এবং ফাঁসির যে-কাষ্ঠে মর্দখইকে হামান ঝুলানোর

চেষ্টা করেছিল, সেই কাষ্ঠে হামানকে ঝুলানোর নির্দেশ দেন।'[১]

এরপর ডেনিয়েল *Jewish Encyclopedia* থেকে রেফারেন্স দিল—

> Haman is the son of Hamamedatha; chief minister of the king Ahasuresus.[২]

হামানকে ফেরাউনের সমসাময়িক মনে করা (যেরকম কুরআন অনুযায়ী) যে একধরনের 'পাগলামি' সেটার রেফারেন্স দিয়ে ডেনিয়েল বলল, 'Pedro La Cavalleria নামের স্পেনের একজন স্কলার ১৪৫০ সালে একটা বই লেখেন। সেখানে তিনি বলেন—

> The madman makes Haman to be contemporary with Pharaoh.[৩]

অর্থাৎ কেবল পাগলরা হামানকে ফারাওয়ের সমসাময়িক হিসেবে মনে করে।

Encyclopedia Britannica অনুযায়ী—

> The most ignorant jew could never have mistaken Haman (the minister of Ahasureus) for the minister of Pharaoh.[৪]

অর্থাৎ, কোনো অজ্ঞ ইহুদী ভুল করেও বলবে না যে, হামান ফেরাউনের মন্ত্রী (বরং অহেশ্বরাসের মন্ত্রী)।

আর কুরআনে যে 'হামান' শব্দটা আছে সেটাও হয়তোবা কোনো আরব ইহুদীর কাছ থেকে শুনে মুহাম্মাদ তার কুরআনে সংযুক্ত করেছেন, তাও ভুলভাবে।

এ সম্পর্কে আত্তুর জাফেরী (Aththur Jaffery) বলেন—

---

[১] বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, বুক অব ইস্টার, ৩ : ১, ৩ : ২, ৩ : ৬, ৪ : ৭, ৪ : ১৬, ৫ : ৩, ৫ : ৭, ৭ : ২, ৭ : ৪, ৭ : ৫, ৭ : ৬, ৭ : ৯

[২] *Jewish Encyclopedia*, Volume 6, Page 189

[৩] *Christ's Zeal against Jews, saracens and infidels* by Pedro La Cavalleria

[৪] The Koran, *Encyclopedia Biritannica* 1899, vol 16, page 600

> The probabilities are that the word came to the Arabs from Jewih sources.[১]

এই বলে ডেনিয়েল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, হামান মিসরের ফারাওয়ের সময়ের মন্ত্রী নয়; বরং পারস্যের রাজা অহেশ্বরাসের (৪৮৬-৪৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সময়ের মন্ত্রী।

এবার আরজুর পালা। ডেনিয়েলের সবগুলো যুক্তির জবাবে আরজু পাল্টা কী আর্গুমেন্টস দেয় সেটা দেখার পালা। টিএসসির অডিটোরিয়াম লোকারণ্য হয়েছে অনেক আগেই। বাইরে থেকে অনেকে ভেতরে ঢুকতে পারছে না দেখে চিল্লাচিল্লি করছে। সবাইকে সুযোগ করে দেবার জন্য কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী একজন একজন করে সবাইকে ভেতরে ঢোকাচ্ছে এবং ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বিতর্ক দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। একটা বিতর্ক দেখতে এরকম লোকারণ্য কি আগে কখনও হয়েছিল? অভিজ্ঞ কেউ বলতে পারবেন হয়তো।

আরজু বিপক্ষের আর্গুমেন্টস শুরু করল, 'মি. ডেনিয়েল অনেকগুলো যুক্তি-রেফারেন্স দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হামান ফারাওয়ের সময়কার নয়; বরং অহেশ্বরাসের সময়কার মন্ত্রী।'

কুরআনে ছয়টি আয়াতে হামান সম্পর্কে বলা হয়েছে।[২] তার মধ্যে আজকে যে আয়াতটি নিয়ে মূলত বিতর্ক সেটা হলো সূরা কাসাসের ৩৮ নাম্বার আয়াত। আল্লাহ বলেছেন—

'আর ফিরআউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব, হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করো। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'[৩]

'কুরআনে আল্লাহ বলেছেন' কথাটা মেনে নেবার জন্য আমার কাছে এটাই যথেষ্ট; কারণ, এটা আল্লাহর বাণী। যেহেতু আপনি এই কথাটা মানবেন না সেহেতু আপনি যে বাণী মানেন সেই বাণী থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করবো, ইন শা আল্লাহ।

---

[১] *A. Jaffery, The Foreign Vocabulary of Quran,* 2007, Volume 3, page 284

[২] সূরা কাসাস, আয়াত : ৬-৮, ৩৮; সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৩৯; সূরা মুমিন, আয়াত : ২৪, ৩৬

[৩] সূরা কাসাস, আয়াত : ৩৮

আপনি বাইবেলের যে বই দিয়ে কুরআনের আয়াতকে ভুল প্রমাণিত করতে চেয়েছেন সেটা হলো Book of Esther। আসুন দেখে নিই, এই বই সম্পর্কে আপনার ধর্মতত্ত্ববিদরা কী বলেন।

Harvard Divinity School এর Jewish Studies-এর প্রফেসর জন লেভেনসন আরবার্ট এ. বলেন, Book of Esther এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে।[১]

Fox বলছেন, এই বইতে বেঠিক এবং অকল্পনীয় ঐতিহাসিক তথ্য আছে।[২]

অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন Lewis Paton,[৩] Carey Moore।[৪]

Jewish Study Bible বলছে, 'বিংশ শতাব্দীর খুব কমসংখ্যক বাইবেল-পণ্ডিত ইস্টারকে একটা ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে মনে করেন।[৫]

Jewish Encyclopedia বুক অব ইস্টারকে একটা 'বিশুদ্ধ কাল্পনিক কাহিনি' বলে উল্লেখ করেছে।[৬]

তাছাড়া প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা মার্টিন লুথার কিং বাইবেল সংস্কার করতে গিয়ে যে দুটো বই বাদ দেবার কথা বিশেষভাবে বলেন তার মধ্যে *Book of Esther* একটি।[৭]

যে বইটার ঐতিহাসিক ভিত্তি এতো নড়বড়ে, এতো প্রশ্নবিদ্ধ—সেই বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে কুরআনের ভুল ধরতে আসা বোকামি নয় কি?

---

[১] D. Lavenson, *Esther : A commentary*, 1997, page 23

[২] M.V. Fox, *Characeand and Ideology in the book of Esther*, 1991, page 131

[৩] L.B. Paton, *A critical and Exegetical Commentary on the Book of Esther*, 1992, page 64-77

[৪] C. A. Moore, *Esther : Introduction Translation and Notes*, 1971, P xxxiv-xlvi

[৫] A. Berlin, *The Book of Esther and Ancient Story Telling*, 2001, vol 120, page 3

[৬] Esther, *Jewish Encyclopedia*, 1905, Volume V, page 235-236

[7] Martin Luther, *Table Talk*, 1995, page 14

তারপরও দেখা যাক, ঐতিহাসিক বিবেচনায় কুরআনের বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ :

Encyclopedia of Brittannica অনুযায়ী ফারাওয়ের সময়সীমা ছিল New Kingdom (১৫৫০-৭৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)।[১] এবং মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবও হয় New Kingdom সময়ে।[২] তাছাড়া হামানের সময়েও New Kingdom এর রাজত্ব ছিল।[৩]

সুতরাং, এই তিনজন ব্যক্তির সময়ের একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে—যা কুরআনের সাথে মিলে যাচ্ছে। অথচ বাইবেল অনুযায়ী যদি তা রাজা অহেশ্বরাসের (৪৮৬-৪৬৫) সময় হয় সেটা তাহলে New Kingdom এর অনেক পরে হতো।

মিসরে ইট পোড়ানোর কাজটা সব যুগে ছিল (Old Kingdom, Middle Kingdom & New Kingdom)।

Splencer তার *Brick Architecture in Ancient Egypt* বইয়ে বলেন—

> Burnt brick was known in Egypt at all periods.[8]

এমনকি মিসরের রাজারা যে সিঁড়ি বেয়ে আকাশে আরোহণ করতে চাইতেন সেই কথা মিসরবিদ Sir Flinders Petrie তার বইয়ে উল্লেখ করেন এভাবে—

> The desire to ascend to the gods in the sky was expressed by wanting the ladder to go up.[৫]

আর ফারাও নিজে যে আদেশ দিয়েছে, তার জন্য এমন সিঁড়ি বানানোর জন্য সেটা উল্লেখ করেছে C. Jacq তিনি লেখেন—

---

[১] *Encyclopedia of Brittannica*

[২] *Encyclopedia of Brittannica*

[৩] H. Ranke, *Die Ägyptischen Personennamen*, volume 1, page 240

[8] Splencer, *Brick Architecture in Ancient Egypt*, 1979, page 141

[৫] Sir. F. Petire, *Religious Life of Ancient Egypt*, 1924, pp 208-209

> Pharaoh orders them to construct a staircase so that he may climp to the sky.[১]

বক্তব্য প্রমাণের জন্য এতেটুকুই যথেষ্ট; কিন্তু তারপরও রয়ে গেছে এক ঐতিহাসিক সত্য।

১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন যখন মিসর অভিযানে বের হন তখন তার এক সৈন্য Rosetta Stone আবিষ্কার করেন প্রাচীন মিসরীয় বিলুপ্ত হস্তলিপি যেটি ছিল হায়ারোগ্লিফিক ভাষায়। লিপিটি হায়ারোগ্লিফিক ছাড়াও গ্রিক ভাষায় লেখা ছিল।

Jean-Francois Champollion নামে এক ফরাসি ১৮২২ সালে লিপিটি গ্রিকভাষা থেকে অনুবাদ করেন।[২]

এরপর Ranke তার *Die Agyptischen Personennamen* গ্রন্থে হামান নামের ব্যাখ্যায় বলেন—

'Vorsteher der Steinbrucharbeitar' (জার্মান) যার অর্থ পাথর আহরণস্থানের কর্মীদের নেতা।[৩] যা কুরআনে বর্ণিত হামানের উপাধির সাথে মিলে যায়।

বিতর্কের একেবারে শেষদিকে আরজু ডেনিয়েলকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল।

'আচ্ছা মি. ডেনিয়েল, বলেন তো, অহসিয় যখন জেরুজালেমের রাজা হন তখন তার বয়স কত ছিল?'

ডেনিয়েল বলল, 'রাজাবলি ২ (৮ : ২৬) এ বলা আছে ২২ বছর।'

আরজু হেসে বলল, 'কিন্তু বংশাবলি ২ (২২ : ২) এ বলা আছে ৪২ বছর! এবার বলেন, জোশেফের বাবার নাম কী?'

ডেনিয়েল বলল, 'জ্যাকব (মথি ১ : ১৬)।'

---

[১] C. Jacaq, *Egyptian Magic*, 1985, page 11

[২] Professor Bob Brier, *The History of Ancient Egypt*, oage 14-15

[৩] Talk : Haman, Wikipedia

আরজু আবারও হেসে বলল, 'কিন্তু লুকের ৩ : ২৩ এ বলা আছে তো জোশেফের বাবা হেলি। এবার বলেন, উজিয়াহ'র বাবা কে?'

এই প্রশ্নের উত্তর ডেনিয়েল দিতে পারল না, মঞ্চে বিচারকের আসনে বসা জোসেফ আড্রিয়ান স্যার বললেন, উজিয়াহ'র বাবা আমাযিয়াহ।

আরজু বলল, 'কিন্তু মথি (১ : ৮) বলছে উজিয়ার বাবা জোরাম!'

বিতর্ক শেষ করার আগে আরজু কুরআনের সূরা বাকারার ২ নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করে বলল—

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।

শেষে ডেনিয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'Charity begins at home, আগে ঘর তবে তো পর!'

বিতর্ক শেষে অতিউৎসাহী কয়েকজন হাততালি দিল, মনে হচ্ছে আরজুর আর্গুমেন্টস শুনে তারা এতোই মুগ্ধ হয়েছে যে, আজকে আর হাততালি দেওয়া বন্ধ করবে না।

বিতর্কের ফলাফল ঘোষণার পর অনেকেই আরজুকে জড়িয়ে ধরছে। ভিড় ঠেলে আর ওই দিকে যেতে পারছি না।

বিশ্বজগত কত দিনে সৃষ্টি?

ব্যস্ত মানুষেরা তাদের ডায়েরিতে লিখে রাখেন ভবিষ্যতে কবে, কোথায় তাদের মিটিং আছে এই সব তথ্য। সেই ডায়েরি থাকে তাদের ব্যক্তিগত সহকারী বা পার্সোনাল এসিস্টেন্ট-এর কাছে। আধুনিক যুগে যাদের ব্যক্তিগত সহকারী রাখার সামর্থ্য নেই মোবাইল ফোনের 'Reminder' অপশনটা তাদের পিএ'র কাজ করে দেয়। তবে আরজু নিয়মিত এরকম একটি ডায়েরিতে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কোথায় কোথায় যাবে এসব লিখে রাখে। তার ঘুমে গেলে মাঝে মাঝে এই ডায়েরি আমি চেক করি। আরজুও রসিকতার ছলে বলে, 'তুই থাকতে আমার আর বেতন দিয়ে পিএ রাখা লাগবে না।'

ডায়েরিতে দেখলাম 'শুক্রবার বিকেলে বুয়েটে রাশেদের সাথে দেখা করব, ইন শা আল্লাহ' লেখা একটা রিমাইন্ডার। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা বুয়েটে যাব; কিন্তু 'যাব যাব' করে যাওয়া হচ্ছে না। আরজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শুক্রবারে তোর সাথে কি আমি বুয়েটে যেতে পারি?'

আরজু হেসে বলল, 'আমি মনে মনে ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে যাব, বলতে ভুলে গেছি। শুক্রবারে বিকেলে একসাথে যাব তাহলে।'

বুয়েটে যাবার জন্য মুহসিন হল থেকে একটা রিকশা ভাড়া করলাম। মুহসিন হল থেকে বুয়েটে যেতে ১৫ মিনিটের বেশি লাগার কথা না, কিন্তু টিএসসিতে জ্যাম থাকার কারণে সময় লাগল ৩৫ মিনিট।

বুয়েটে গিয়ে দেখলাম দুইজন ছিমছাম যুবক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আরজু সাধারণত কোথাও ১ মিনিট দেরি করে যায় না; বরং নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট আগে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। আজ কেন দেরি হয়েছে এ কথা তাদের একজন জিজ্ঞেস করলে আরজু টিএসসির ওই জ্যামের কথা বলল।

বুয়েটের এই দুটো ছেলের মধ্যে একজনকে আমার কাছে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে, সেই ছেলেও আমার দিকে কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে অপলক চেয়ে আছে। আরজু আমাকে সম্বোধন করে বলল, 'আরিফ, তোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে রাশেদ আর এ হচ্ছে অর্ণব।'

পরিচিত-পরিচিত ছেলেটির নাম 'রাশেদ' শুনতে পেয়ে আমার মুখে এক হাসির রেখা ফুটে উঠল। কালবিলম্ব না করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই আমার বন্ধু রাশেদ না?' সে 'হ্যাঁ' কি 'না' উত্তর না দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল! রাশেদ আমার স্কুলবন্ধু ছিল। ক্লাস সিক্স এবং সেভেন আমরা একসাথে পড়েছি। একবার তার জন্মদিনে জাফর ইকবালের *আমার বন্ধু রাশেদ* বইটা তাকে উপহার দিই। সেই থেকে রাশেদকে 'আমার বন্ধু রাশেদ' নামে ডাকি। ক্লাস এইটে ওঠার পর তার বাবা আমাদের ওখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে অন্যত্র চলে যান, সাথে রাশেদও। সেই থেকে তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। তাছাড়া এখন তার মাথায় আইনস্টাইনের মতো চুল, তাকে দেখে তো চেনার উপায়ই নেই। আজ অনেকদিন পর সেই বন্ধুকে পেয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলাম যে, পরে আরজু এসে আমাদের দুজনকে টেনে ছুটাল।

অনেক্ষণ মন খুলে রাশেদের সাথে আড্ডা দেবার পর আরজু রাশেদকে বলল, 'তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তরগুলো আরেকদিন দিই?' আমি রাশেদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের প্রশ্ন রে?' রাশেদ কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে আরজুর দিকে তাকালাম। আরজু বলল, 'রাশেদ জানতে চেয়েছে, কুরআনের বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে যে-তথ্য দেওয়া হয়েছে সেটা স্ববিরোধী কি না। অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি ৬ দিনে, নাকি ৮ দিনে হয়েছে।'

রাশেদ বলল, 'যেহেতু এটার উত্তর জানানোর জন্যই আজকে এসেছে সেহেতু বলে ফেলো।' আমিও রাশেদের কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, বলে ফেলো।'

আরজু রাশেকে বলল তাদের প্রশ্নগুলো আবার ঠিকমতো বলতে।

'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ কয় দিনে সৃষ্টি করেছেন সে-সম্পর্কে কুরআনে ৭ টি আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আরাফ : ৫৪, সূরা ইউনুস : ৩, সূরা হুদ : ৭, সূরা ফুরকান : ৫৯, সূরা সিজদাহ : ৪, সূরা ক্বাফ : ৩৮, সূরা হাদীদ : ৪। এই ছয় আয়াতে বলা হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা হয়েছে ৬ দিনে; কিন্তু ৪১ নাম্বার সূরা ফুসসিলাতের ৯-১২ আয়াতে বলা হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা হয়েছে ৮ দিনে। তার মানে, কুরআনে পরস্পরবিরোধী আয়াত আছে!'—এটুকু বলে থামল রাশেদ।

'ওই আয়াতগুলোতে কি সরাসরি বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত ৮ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে?'

'না, সরাসরি বলা হয় নাই, কিন্তু এটা সিম্পল ব্যাপার। আমরা ক্যালকুলেশন করলেই পেয়ে যাই। যেমন, ফুসসিলাত সূরার ৯ নাম্বার আয়াতে বলেন, তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ২ দিনে, পরের আয়াতে বলেন পর্বতমালা এবং পৃথিবীর উপরিভাগে যা আছে তা সৃষ্টি করেছেন ৪ দিনে আর ১২ নাম্বার আয়াতে বলেন, আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেন ২ দিনে। অর্থাৎ ২+৪+২ = ৮। এটা তো ক্লাস টু'তে পড়া বাচ্চাও বলতে পারবে।'

আরজু রাশেদের কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা তো একজন আর্কিটেক্ট?'

'হ্যাঁ, তিনি বিশেষ করে বিল্ডিং-এর ডিজাইন করে।'

'আচ্ছা, ধরে নিলাম তোমার বাবা ৫ বছরে ৩ টি বিল্ডিং ডিজাইন করেন এবং এই ৫ বছরেই সবগুলো বিল্ডিং এর কাজ শেষ হয়। এখন মন দিয়ে শোনো আর আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

আমরা আরেকটু মন দিয়ে শুনতে লাগলাম, দেখি, আরজু কী প্রশ্ন করে।

আরজু বলল, 'ধরো, তোমার বাবা প্রথম যে-বিল্ডিং ডিজাইন করেন সেটির কাজ শেষ হতে লাগল ২ বছর। দ্বিতীয় যে-বিল্ডিংটির কাজ করেন সেটির কাজ শেষ হয় ৪ বছরে আর শেষ যে-বিল্ডিংটির ডিজাইন করেন সেটির কাজ শেষ হয় ১ বছরে। তাহলে এবার বলো, বিল্ডিংগুলোর কাজ শেষ হতে মোট কয় বছর লাগল?'

আমি হিসেব করে দেখলাম, প্রথমটার ক্ষেত্রে ২ বছর + দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে ৪ বছর + তৃতীয়টার ক্ষেত্রে ১ বছর, মোট ৭ বছর।

হিসাব শেষ করে আমি যখন বললাম ৭ বছর তখন রাশেদ আর অর্ণব বলল ৫ বছর। আমি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকালাম, রাশেদ আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'তুই আগের মতোই গণিতে কাঁচা রয়ে গেছিস এখনও?'

ক্লাস সিক্সের প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় গণিতে আমি ফেল করি। তারপর নিয়মিত রাশেদের সাথে গণিত প্র্যাকটিস করে বার্ষিক পরীক্ষায় এ প্লাস পাই।

রাশেদ পরে বুঝিয়ে বলল, 'আরজু প্রথমেই তো শর্ত বলছে, ৫ বছরের মধ্যে সবগুলো বিল্ডিং এর কাজ শেষ হবে। তার মানে, সবগুলো বিল্ডিং-এর কাজ একটার পর একটা করে শেষ হয়নি; বরং যখন প্রথম বিল্ডিং এর কাজ চলছিল তখনও দ্বিতীয় বিল্ডিং এর কাজ চলছে।'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমিও হাসলাম।

এবার আরজু রাশেদকে বলল, 'দেখো রাশেদ, কুরআনেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিজগত ৬ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়েছে, কোন সৃষ্টি কয়দিনে হয়েছে। আরিফের মতো সবগুলো একসাথে যোগ করে করলে তো হবে না, কী বলা হয়েছে সেটাও তো দেখতে হবে। কুরআনে ফুসসিলাত সূরার ১০ নাম্বার আয়াতে ৪ দিনে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে এই আয়াতে যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো 'সুম্মা'। সুম্মা শব্দের অনেকগুলো অর্থ—পরে, তন্মধ্যে, অধিকন্তু, (then, therein, moreover)।

১০ নাম্বার আয়াতে 'সুম্মা' শব্দের কোন অর্থ নেওয়া হয়েছে সেটা যদি আমরা কুরআনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইংলিশ অনুবাদক ইউসুফ আলীর অনুবাদে দেখি তাহলে আমরা পাই—

> He set on the (earth), mountains standing firm, high above it, and bestowed blessings on the earth, and measure 'therein' all things to give them nourishment in due proportion, in four Days, in accordance with (the needs of) those who seek (Sustenance).

অর্থাৎ এই 'সুম্মা' শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে লেখক এইস্থলে সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ অর্থাৎ 'therein' বা তন্মধ্যে শব্দটি নির্বাচন করেছেন। আর তুমি যদি এই তিন আয়াতের

অনুবাদ ভালো করে পড়ো তাহলে দেখতে পাবে ১১ নাম্বার আয়াতটি Consequential order বা অনুবর্তী ক্রম না; বরং এটি Overlapping action বা অধিক্রমণ ক্রিয়া।'

এই বলে একটা ছোট্ট লেকচার শেষ করল আরজু।

রাশেদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরে, তুই না গণিতে পাকা, এই সামান্য জিনিস বুঝতে তোর এতো সমস্যা আর আমাকে তুই গণিতে কাঁচা বলিস?'

রাশেদ হেসে বলল, 'Wiki Islam এ তারা যেভাবে এই তথ্যগুলো দেয়, এগুলো পড়লে যে কেউ বিভ্রান্ত হবে!'

আরজু হেসে বলল, 'ইসলাম জানার জন্য তোমাকে Wiki Islam এ ঢুকতে হবে কেন? আরও তো অনেক সোর্স আছে।'

রাশেদ আরজুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'মাগরিবের নামাজের আযান দিচ্ছে, চলো নামাজে যাই।'

শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে বুয়েটের যে-রাস্তা গেছে সেখানে একটা মসজিদ, একে বাইরে থেকে দেখলে কেউ মসজিদ বলবে না। এতো সুন্দর ডিজাইনে সাজানো যে, আমি প্রথম ২ মিনিট মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে শুধু মসজিদটাই দেখলাম।

চিন্তা করলাম, বুয়েটের আর্কিটেক্টরা কত সুন্দর ডিজাইনে পুরো বুয়েট সাজিয়েছে আর মহান আল্লাহ কি নিখুঁতভাবে তার সৃষ্টজগত দ্বারা মানুষকে চ্যালেঞ্জ করছেন সামান্য খুঁত বের করার জন্য!

ব্লাক হোল

অনেকদিন ধরে চাচার বাসায় যাই না। চাচা কয়েকদিন ধরে ফোন করছেন বাসায় যাবার জন্য। অপেক্ষা করছিলাম বৃহস্পতিবারের জন্য। একা যেতে ভালো লাগছে না তাই আরজুকে যেতে বললাম। আরজু রাজি হয়ে গেল।

ক্লাস শেষে বাসের জন্য ভিসি চত্বরে অপেক্ষা করছি, বাস আসতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অভি এলো আমাদের কাছে। আরজুর হাতে কলমের দাগ দেখে অভি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কীরে আরজু, ব্লু হোয়েল খেলা শুরু করেছিস নাকি? হাতে দাগ দিয়ে কি তিমি আঁকতে চাইছিলি?'

অভি যখন প্রশ্নটা করল তখন আমাদের পাশ দিয়ে একটা মোটর সাইকেল হর্ন বাজিয়ে গেল, তাই ব্লু হোয়েলের জায়গায় আরজু ব্ল্যাক হোল শুনতে পেল।

আরজু হেসে উত্তর দিল, 'কী বলেছিস এগুলো, ব্ল্যাক হোল আবার খেলা যায় নাকি, জানতাম না তো!'

'আরে আমি ব্লু হোয়েলের কথা বলছি, আর তুই কি না ব্লাক হোলের কথা বলছিস!'

আরজু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্লু হোয়েল আবার কী?'

অভি মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'কাকে কী বলি? তুই দুনিয়ার ওপরে থাকিস নাকি নিচে, ব্লু হোয়েল গেইম চিনিস না? তো বল, ব্লাক হোল আবার কী?'

আরজু বলল, ‘মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু হলো ব্লাক হোল, বাংলায় যাকে কৃষ্ণ গহ্বর বলে।’

ব্লাক হোল শুনে মনে না পড়লেও কৃষ্ণ গহ্বর শুনে মনে পড়ল হাই-স্কুলে থাকতে বিজ্ঞান বইতে এর নাম পড়েছিলাম।

এবার অভি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ব্লাক হোল মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু কেন?’

এসএসসি-এইচএসসিতে সাইন্সে ছিল আরজু। বিজ্ঞানের কোনো থিওরি অনেক সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে সে, আর্টস-কমার্সে পড়া ছাত্ররাও আরজুর এসব ব্যাখ্যা বুঝতে পারে। বাস আসতে যেহেতু দেরি হবে তাই আমরা মল-চত্বরের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

আরজু বলা শুরু করল, ‘মহাবিশ্বে এমন এক স্থান আছে, যা এমন শক্তিশালী মহাকর্ষ বল (Gravitational Force) তৈরি করে যে, এটি তার কাছাকাছি যেকোনো বস্তুকে একেবারে টেনে নিয়ে যায়, হোক তা কোনো গ্রহ, ধূমকেতু বা স্পেসক্রাফট।

যেমন আমরা দেখতে পাই, চুম্বক যেমন তার পাশের লোহাকে টেনে নিয়ে যায় তেমনই কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোলও তার আশেপাশের সবকিছু টেনে নিয়ে যায়।

আর কোনো তারকা কৃষ্ণ গহ্বরের খুব কাছাকাছি এলে তার নিকটতর ও দূরের অংশে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের পার্থক্যের জন্য তারকাটি ছিন্ন হয়ে যায় এবং অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য তারকা থেকে যে-সমস্ত বায়বীয় পদার্থ নির্গত হয় সবই গিয়ে পড়ে কৃষ্ণ গহ্বরে।’

কৃষ্ণ গহ্বর সম্পর্কে আরজুর বলার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এটা কি কোনো সাইন্স ফিকশন নাকি সরাসরি এটি একজিস্ট করে।

আরজুকে জিজ্ঞেস করলে আরজু বলে, ‘এটা সাইন্টিফিকালি প্রুভড। ১৯১৬ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন তার জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি তত্ত্ব দিয়ে ধারণা করেন ব্ল্যাক হোল থাকা সম্ভব।[১]

---

[১] A Singular Place (https : //www.cosmotography.com/images/supermassive_blackholes_drive_galaxy_evolution.html)

জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল শোয়ার্জ স্কাইল্ড (Karl Schwarzscild) একই বছর দেখান যে, যে-কোনো তারকা ব্ল্যাক হোলে পতিত হতে পারে।

১৯৯৪ সালে নভোচারীরা প্রমাণ করেন যে, ব্ল্যাক হোল আসলেই আছে।

মার্কিন বিজ্ঞানী জন আর্চিবল্ড হুইলার এর নাম Black Hole রাখেন।'

ব্ল্যাক হোল নিয়ে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল, এটি কি দেখা যায়? কিন্তু পরক্ষণে অভি সেই প্রশ্ন করল।

আরজু বলল, 'না, ব্ল্যাক হোল দেখা যায় না। কৃষ্ণ গহ্বরের ভেতরে মধ্যাকর্ষণ শক্তি এতোই বেশি থাকে যে, এর সীমানার মধ্যে যা-কিছু আসে তার সবই এর ভেতরে হারিয়ে যায়। এমনকি আলোও এর আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। যার কারণে কৃষ্ণ গহ্বর দেখা যায় না।'

'তাহলে একটা কৃষ্ণ গহ্বরের আকার কত বড়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সবচেয়ে বেশি ভরের কৃষ্ণ গহ্বর হচ্ছে আমাদের সূর্যের চেয়ে ৪০ বিলিয়ন বা ৪০০ কোটি গুণ ভারী।'

বাস আসার সময় হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আমরা মল চত্বর থেকে ভিসি চত্বরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

আরজু বলল, 'এই ব্ল্যাক হোলের কথা কিন্তু পবিত্র কুরআনে আছে।'

আরজুর কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'যে তত্ত্বটা মাত্র গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই তত্ত্ব পবিত্র কুরআনে আছে?'

'পবিত্র কুরআনের ৫৬ নাম্বার সূরা ওয়াকিয়ার ৭৫-৭৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন, শপথ করছি, নক্ষত্র সমূহের পতিত হওয়ার স্থানের। অবশ্যই এটা মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে।'

এখানে দেখ, আল্লাহ শপথ করেছেন এমন এক স্থানের—যেখানে নক্ষত্র পতিত হয়। গত শতাব্দীতে এসে আমরা জেনেছি, সেই স্থানের নাম কৃষ্ণ গহ্বর যেখানে নক্ষত্রসমূহ পতিত হয়। তাছাড়া এটার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ মহাশপথের কথা

বলেছেন এবং তৎকালীন লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তারা তা জানে না।

আজ আমরা জানতে পেরেছি নক্ষত্রসমূহের পতনের স্থানের কথা—যা কুরআন যখন নাজিল হয় তখন কেউ জানত না এবং এই কৃষ্ণ গহ্বর বলতে আমরা যাকে বোঝাই, তার নামে আল্লাহ শপথ করেছেন।'

এরই মধ্যে আমাদের লাল বাস চলে আসছে। বাসে উঠতে উঠতে চিন্তা করলাম, কুরআন যে এক বিজ্ঞানময় গ্রন্থ সে-সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন—

শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, By the wise Quran.[১]

[১] সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ০২

সমকামিতার রঙধনু

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আরজু পড়ার টেবিলে বসে *তাফসীর ইবনে কাসীর* পড়ছে। নিশ্চয়ই সূরা কাহাফের তাফসীর পড়ছে; কারণ, শুক্রবারে সে সূরা কাহাফ আরবীতে দেখে দেখে তেলাওয়াত করে। সেদিন বলেছিল এটার তাফসীর ও পড়তে চাচ্ছে।

হাত-মুখ ধুয়ে রুমে ঢোকার সময় দেখলাম আজকের পত্রিকা জানালার পাশে রাখা, আগে প্রতিদিন জানালার পাশ থেকে পত্রিকা নিয়ে রুমে রাখত আরজু; কিন্তু ইদানীং সামান্য কাজও আমার সাথে ভাগাভাগি করে, আমি নাকি দিন দিন অলস হয়ে যাচ্ছি। তাই মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে পত্রিকা জায়গামতো রাখলে সকাল বেলা থেকেই আলসেমী ভাব কমবে!

জানালার পাশ থেকে পত্রিকা নিয়ে রুমে ঢুকব, এরই মধ্যে দেখি বিপ্লব দা এক বক্স মিষ্টি হাতে হাসিমুখে এদিকে আসছেন। বিপ্লব দা'কে হাসিমুখে এর আগে কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। সারাদিন থাকেন ডাকসুর দিকে, আজ এই আন্দোলন তো কাল ওই আন্দোলন নিয়ে। মাঝে মাঝে যখন আমাদের সাথে দেখা হয় তখন আরজুর যুক্তির কাছে হেরে নাস্তানাবুদ হয়ে আবার মলিন মুখে আবর্তিত হন। মিষ্টির বক্স নিয়ে রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'হুজুররা ঘুম থেকে উঠে পড়ছ নাকি, আমি আরও চিন্তায় ছিলাম এতো তাড়াতাড়ি উঠছ কি না!' আমিও মজা করে বললাম, 'হুজুররা তো মোরগ ডাকার আগে ঘুম থেকে ওঠে!'

বিপ্লব দা হেসে বললেন, 'তোমরা তো আবার 'early to bed, early to rise' টাইপের।'

'তো বিপ্লব দা, আজকে এতো হাসিখুশি আর মিষ্টি আনার কারণ কী?'

'আরে আছে আছে, অনেকগুলো কারণ। কোনটা রেখে কোনটা বলি!'

'তার মানে, দিদিকে কি প্রপোজ করে ফেলেছেন, নাকি দিদি একসেপ্ট করেছে?'

'আরে না না, এসব কিছু না। আর আমাকে দিয়ে ওসব হবে না। ওসব করবে তো তোমাদের মতো কিউট ছেলেরা!'

'তাহলে হয়েছে কী, বলেন?'

আরজু আমাকে বলল, 'আরে গাধা, আজকের পেপারটা অন্তত পড়, তাহলে বুঝতে পারবি!'

হাতে থাকা পত্রিকা খুলে দেখলাম দুটো বরের ছবি পাশাপাশি, শিরোনামে লেখা 'যুক্তরাজ্যে প্রথম মুসলিম সমকামী জুটির বিয়ে'। দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্টের সূত্র দিয়ে বিস্তারিত বলা আছে, যুক্তরাজ্যের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের ওয়ালসাল শহরে জাহেদ চৌধুরী ও সোয়ান রোগান বিয়ে করেছেন।

বিপ্লব দা'কে দেখিয়ে বললাম, 'মিষ্টি আনার উপলক্ষ্য কি এই নিউজটা?'

'আরে না না, এটা তো আমি একটু আগে পড়লাম। তবে হ্যাঁ, এটা দেখার পর আরও ভালো লেগেছে যে, পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে।'

পত্রিকার পরের পৃষ্ঠা উল্টাতে দেখলাম বিপ্লব দা'র ছবি। তিনি তার ফেডারেশনের সেক্রেটারি হয়েছেন। বিপ্লব দা'কে আমি আর আরজু অভিনন্দন জানিয়ে হ্যান্ডশেক করলাম।

বিপ্লব দা চিরচেনা হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝলি আরিফ, ভালো লাগে—যখন দেখি বিশ্বের কোথাও-না-কোথাও মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছে, এমনকি স্বাধীনভাবে জীবনসঙ্গীও নির্ধারণ করতে পারছে।'

'সমকামিতাকে তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলছেন?'

'তা নয়তো কী? মানুষ তার ইচ্ছেমতো জীবনসঙ্গী পছন্দ করতে পারছে সেটা স্বাধীনতা না হলে কোনটা স্বাধীনতা!'

'বিপ্লব দা, সব স্বাধীনতা যদি গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে আপনার কিংবা আমাদের বাবাও সমকামী হতে পারতেন, পারতেন কি না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই পারতেন। তবে তাদের সময়ে তো তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে এতো সচেতন ছিলেন না, তাই সমাজের গতানুগতিক রীতি অবলম্বন করেছেন।'

হেসে বললাম, 'তারা সমাজের গতানুগতিক রীতি অবলম্বন করেছেন বলেই আমাদের জন্ম হয়েছে, তাই আমরা আজ স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বলে চিল্লাচ্ছি।'

আমার কথা শুনে আরজুও হাসল।

বিপ্লব দা বললেন, 'সমকামিতা তো জেনেটিক্যাল, তো কেউ একজন জেনেটিক্যালি যদি সমকামী হয় তাহলে তাকে বাধা দেওয়া কি তার স্বাধীনতায় আঘাত করা না?'

এবার আরজু বলল, 'আচ্ছা বিপ্লব দা, কেউ যদি সমকামিতায় জড়িয়ে পড়ে যেটাকে একসময় মানসিক রোগ হিসেবে ধরে নেওয়া হতো, তাহলে সেই পাগলামী সে অন্তরালে লুকিয়ে লুকিয়ে করুক; কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন তারা প্রকাশ্যে এসে এর স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করে। আর কে বলল আপনাকে, সমকামিতা জেনেটিক্যাল ডিসফাংশনের জন্য হয়?'

'সাইন্সে সেটা প্রমাণিত!'

আরজু হাসল, 'বিপ্লব দা, সাইন্সে এটাও প্রমাণিত যে, প্রাথমিক পর্যায়ে যারা এইডস রোগী ছিল তারা সমকামী ছিল; আর বলা হয়ে থাকে, এইডস রোগের ভাইরাস ছড়িয়েছে এই সমকামিতার জন্যই। আর সমকামিতা থেকে যে একসময় এইডস রোগ ছড়ায় সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে সাবেক Salk Institute-এর রিসার্চার Simon Levay এর একটি গবেষণায়। তিনি ১৮ জন সমকামীদের (Homosexuals) নিয়ে গবেষণা করেন যাদের প্রত্যেকেই এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা যান। যে কাজটা একটা রোগ ছড়ায় আপনি কীভাবে বলবেন সেটা একটা স্বাধীনতা?'

বিপ্লব দা নিজের যুক্তিতে অনড় থেকে আবার বললেন, 'যেহেতু সমকামিতা একটা জেনেটিক্যাল সমস্যা সেহেতু তাদের তো আর কোনোভাবে অন্যদিকে ডাইভার্ট করা যাবে না।'

অট্টহাসি হেসে আরজু বলল, 'কথায় কথায় তো আপনারা আমেরিকার উদাহরণ দেন, সেখানে নাকি মানুষ স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। বিজ্ঞানীদের উদাহরণ দিতে গেলেও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের উদাহরণ টানেন। সেই আমেরিকার সবচেয়ে বড় জেনেটিক ডিপার্টমেন্টের প্রধান বিলিংস (Billings) এবং হার্ভার্ডের ব্যাকউইথ (Beckwith) তারা দুজনে 'সমকামিতা কি জেনেটিক্যাল নাকি পরিবেশের কারণে হয়ে থাকে?' এই সংক্রান্ত গবেষণা করে বলেন, Homosexuality is environmental influence rather than genetic. অর্থাৎ, পরিবেশগত প্রভাবের কারণেই মানুষ সমকামী হয়, জেনেটিক্যাল কারণের জন্য নয়।

আর সমকামীরা যে ডাইভার্ট করতে পারবে না সেটাও মিথ্যা। Exodus International বিশ্বের ১৭ টি দেশে ১৩৫ টি প্রোগ্রাম করেছে। তাদের প্রোগ্রামের মটো ছিল 'Change is possible' বা 'পরিবর্তন সম্ভব'। এই সংগঠনের ফাউন্ডার জেমস ডবসন (James Dobson) বলেন, 'Homosexuality is preventable and treatable'

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এমডি রবার্ট স্পাইজার (Robert Spitzer) ২০০১ সালে ২০০ জন সমকামীদের নিয়ে গবেষণা করেন—যারা দাবি করেছে সমকামী (Homosexual) থেকে তারা (Heterosexual) হতে পেরেছে।'

এই বলে আরজু থামল। বিপ্লব দা'র টি-শার্টের পেছনে দেখলাম লেখা 'Annual Tour 2k17 Department of Law'। আমি আগে জানতাম না যে, বিপ্লব দা আইন বিভাগের ছাত্র।

বিপ্লব দা'কে জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদা আপনি তো আইন বিভাগের ছাত্র, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো বাংলাদেশের দণ্ডবিধির (Penal Code) ধারাগুলো নিশ্চয়ই পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, আইনের ছাত্র হয়ে দণ্ডবিধি পড়ব না, এটা কোনো কথা হলো। অবশ্যই পড়েছি।'

রুমের এক ভাই জুডিশিয়ারীর প্রিপারেশন নিচ্ছিলেন, তার বাংলাদেশের দণ্ডবিধির বইটা আমার টেবিলে রাখা। একদিন বইটা এনে এমনিই উল্টে দেখছিলাম, তখন একটা ধারা মার্ক করে রেখেছি। ভাবতে পারিনি, তার এক সপ্তাহের মধ্যে এই ধারা কাজে লাগবে।

বইটি টেবিল থেকে এনে উল্টালাম, আগের মার্ক করা জায়গাটি ওই আগের মতোই মার্ক করা আছে।

বিপ্লব দা'কে পড়ে শোনালাম, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় বলা হয়েছে, 'যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষ, নারী বা জন্তুর সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করেন, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা দশবছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।'

আপনি একজন আইনের ছাত্র হয়ে কীভাবে বাংলাদেশের আইনের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন; তাও একটা অযৌক্তিক ইস্যু তথা সমকামিতা নিয়ে—যা সামাজিক সমস্যা তথা সন্তান জন্মদান করাতে সক্ষম না; এমনকি যার ফলে এইডস রোগের মতো মরণব্যাধী রোগের শঙ্কাও রয়েছে?

বিপ্লব দা চুপ হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। মিষ্টির বক্স হাতে নিয়ে মুখ কালো করে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। ফেডারেশনের সেক্রেটারি হওয়া উপলক্ষ্যে আমাদের আর মিষ্টি খাওয়া হলো না!

আরজু বলল, 'সমকামিতার চিহ্ন বলা হয় রঙধনু। অথচ তাদের মধ্যে শুধু কালো রঙ ছাড়া রঙধনুর আর কোনো রঙ আমি দেখতে পাই না।'

ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ

অনেকদিন ধরে ফেসবুকের কাভার ফটোর সংকটে ভুগছি। যখনই কাভার ফটোর সংকটে ভুগি তখনই আরজুর প্রোফাইলে ঢুঁ মারি। যদিও ফেসবুক এ্যাপ দিয়ে কাভার ফটো ডাউনলোড করা যায় না, তবে ছবি পছন্দ হলে আরজুকে বলি ওটা আমাকে ম্যাসেঞ্জারে দিয়ে দিতে। সে দিলে ওটা আপলোড করি।

দেখলাম আরজুর কাভার ফটোতে দুটো লাইন লেখা—

'ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন
দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহে খামকা ক্ষুব্ধ মন।'

এই লাইনগুলোর কোনো মানে বুঝলাম না। আরজুর বেশিরভাগ ছবিরই মানে বুঝতে পারি না, দেখা হলে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই।

ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে দেখলাম, বিপ্লব দাদার একটা কাভার ফটো,

'এবার কুরবানী না দিয়ে বন্যার্তদের সাহায্য করুন, সেটাই বড় কুরবানী।'

আইডিয়াটা আমার অনেক ভালো লাগল, ছবিটা আমার কাভার ফটোতে দিয়ে দিই।

দুই মিনিট পর আরজু রুমে ঢুকল। মোবাইল হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আরজুকে এরকম রাগান্বিত হতে কখনও দেখিনি। মাটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে কী যেন বিড়বিড় করে পড়ে শান্ত গলায় আমাকে বলল, 'আরিফ, তোকে

তো আমি বুদ্ধিমান ভাবতাম; কিন্তু তুই বোকার মতো এমন একটা কাজ করলি যে নাস্তিক-সেক্যুলারদের সামান্য ট্রিকটুকুও বুঝলি না?'

রাজ্যের অবাক বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বুঝিয়ে বল কী হয়েছে?'

'এটা কী কাভার ফটো দিয়েছিস? কুরবানী বাদ দিয়ে বন্যার্তদের সাহায্য করা নিয়ে।'

চার বছরের পরিচয়ে আরজুর সাথে কখনও আমার তর্কাতর্কি হয়নি; বরং অনেক তর্কে যখন সে নাস্তিকদের পরাজিত করেছে সেগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আমি। আজকের এটা নিয়ে আরজুর সাথে তর্ক করা যায়। এরকম জাতীয় দুর্দিনে কুরবানী না দিলে কী এমন ক্ষতি হবে!

বসার জন্য চেয়ার টেনে দিলাম। আরজু শান্ত হয়ে বসল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবারের বন্যার ছবিগুলোর মধ্যে ফেসবুকে কোন ছবিগুলো সবচেয়ে ভাইরাল হইছে বল তো?'

'ওই যে বন্যার্ত মানুষগুলো নিজেদের জিনিসপত্র নেবার পাশাপাশি গোরু-ছাগল নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছে সেগুলো।'

'এরকম ছবি তো তুইও ডাউনলোড করে ফেসবুকে আপলোড দিয়েছিস।'

আমি সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, অনেকগুলোই তো দিয়েছি।'

আরজু তখন বলল, 'আচ্ছা বল তো, বন্যার্ত মানুষগুলো নিজেদের জিনিসপত্র নেবার পাশাপাশি গবাদি পশুগুলো কেন কোলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'হয়তো-বা তাদের পোষা প্রাণীগুলোর মায়া ত্যাগ করতে পারছে না তাই।'

আমার কথা শুনে আরজু হাসল। 'আচ্ছা বল তো, কুরবানী না দিয়ে বন্যার্তদের যদি সাহায্য করা হয় তাহলে প্রতিটি পরিবার সর্বোচ্চ কত টাকা পেতে পারে?'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'খুব বেশি হলে ৩০০০-৩৫০০ টাকা কিংবা সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা।'

আরজু আরেকটু হেসে বলল, 'এত্ত কম! আমি আরও ভেবেছিলাম আরেকটু বেশি বলবি! তাহলে দেখ ওই সব বন্যার্ত মানুষগুলো যদি তাদের গবাদি পশু কুরবানীর বাজারে বিক্রি করে এমনকি একটা ছাগলও বিক্রি করে তাহলে কমপক্ষে ১০, ০০০ টাকা পাবে। আর গোরু বিক্রি করলে তো কমপক্ষে ৩০, ০০০ টাকা। একটা ছাগল বিক্রির টাকাও তোরা কুরবানী না দিয়ে তাদের দিতে পারবি না! সে জায়গায় যদি কুরবানী দেওয়া বন্ধ করে দিস তাহলে বন্যার্ত মানুষগুলো তাদের পশুগুলো কী করবে?'

আরজুর কথা শুনে আমার টনক নড়ল, আসলেই তো! এসব বন্যার্ত মানুষগুলো নিজেদের সন্তানের মতো আগলে রেখে গবাদি পশু নিয়ে যাচ্ছে, সেটা তো আর শখ করে না!

এবার আরজু বলল, 'ইসলামী আইন সম্পর্কে তো তোর কিছু ধারণা থাকা দরকার। কুরবানী পালন করা ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ কুরবানীর কথা বলেছেন।[১] এখন যদি কোনো মুমিন আল্লাহর আইনের বিরোধিতা (যেমন এবার কুরবানী না করে বন্যার্তদের সাহায্য করি) করে তাহলে তো সে ইসলামী আইন অনুযায়ী 'ফাসিক'। আর তুই তো জানিস, ফাসিক হওয়া একজন মুমিনের জন্য কত বড় অপমানের!'

আমি মাথা নিচু করে আরজুর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ জানি।'

'তাছাড়া আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।[২] এখন চিন্তা কর, বর্তমান পরিস্থিতিতে তুই যদি মনে করিস, এবার কুরবানী না দিয়ে বন্যার্তদের সাহায্য করবি তাহলে দেখ একদিকে যেমন বন্যার্তরা তাদের সারা বছরের লালন-পালন করা পশু বিক্রি করতে না পেরে যেরকম ক্ষতির সম্মুখীন হবে সেটা তাদের ত্রাণের ৩০০০-৩৫০০ টাকা দিলে পূর্ণ হবার কথা না। দ্বিতীয়ত, মানুষ যেরকম আগ্রহ নিয়ে কুরবানী দেবে সেরকম আগ্রহ নিয়ে ত্রাণ দেবে না। তুই তো বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করেছিস, দেখেছিস না, মানুষ তোদের ত্রাণের টাকা দিতে বিশ্বাস করতে পারছে না তোরা আদৌ ত্রাণের টাকা দিতে পারবি কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে!'

---

[১] সূরা কাউসার, আয়াত : ০২, সূরা হজ, আয়াত : ৩৪

[২] *সহীহ ইবনে মাজাহ* : ২৩৫২

আমি আবারও আরজুর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ত্রাণের জন্য টাকা তুলতে গিয়ে মানুষ কত রকম কথা বলছে! কিন্তু আমি ভাবছিলাম, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কুরবানীর টাকা দিলে বন্যার্তদের হয়তো উপকার হতো।'

আমার কথা শুনে আরজু আবারও হেসে বলল, 'আল্লাহর আইন অমান্য করে এই সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ হবার কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরের ১৪ নাম্বার আয়াতে বলেছেন—

'আপনি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শত বিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়।'

তার ওপর, তুই তো জানিস, কুরবানীর মাংসের ডিস্ট্রিবিউশনের কথা। এগুলো কিংবা এগুলোর টাকা যদি সঠিকভাবে একভাগ এসব বন্যার্তদের কল্যাণে বণ্টন করা হয় তাহলে একদিকে তারা পশু বিক্রি করে টাকা পাবে, অন্যদিকে মাংসের এক-তৃতীয়াংশের টাকা বা মাংস পাবে।'

আমি বললাম, 'আসলেই তো, এটাই ভালো হয়; কিন্তু বন্যার্ত এলাকায় গিয়ে এসব পশু কে কেনবে বল?'

আরজু জোর গলায় বলল, 'এজন্য দরকার সরকারি উদ্যোগ। দেখছিস না, আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, এবার কুরবানীর পশুগুলো যেন বন্যার্ত এলাকা থেকে একটু বেশি দাম দিয়ে হলেও কিনুন, এতে বন্যার্ত মানুষগুলো উপকৃত হবে।'[১]

আরজুর এরকম বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির কাছে হেরেও ভালো লাগছে। আরজু যখন চলে যাচ্ছিল তখন ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর ওই কাভার ফটোর মানে কী?'

'যারা কুরবানীকে পশুহত্যা বলে তাদের ব্যাঙ্গা করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই লাইনগুলো লিখেছিলেন।'

আরজুর কাছ থেকে ওই কাভার ফটো এনে আগেরটা ডিলেট দিয়ে আরজুরটা দিলাম আমার কাভার ফটো হিসেবে।

---

[১] *বাংলা ট্রিবিউন*, আগস্ট ১৬, ২০১৭

ইসলামে দাসপ্রথা বনাম পাশ্চাত্যে দাস ব্যাবসা

মেসি-রোনালদো-নেইমাররা কি আধুনিক যুগের দাস? পত্রিকায় খেলার পাতায় এই মৌসুমের ট্রান্সফার পড়তে গিয়ে মনে প্রশ্ন জাগল। যেভাবে তাদের কেনাবেচা হয় আদিম কালে তো এভাবে দাস কেনাবেচা হতো।

আরজু শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। হ্যারিয়েট বিচার স্টোরের লেখা Uncle Tom's Cabin. ইদানীং সে ইংরেজি সাহিত্যে মন দিয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের মতো হতে চাচ্ছে কি না কে জানে।

আরজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফুটবল খেলায় এই যে খেলোয়াড়দের বেচাকেনা হয়, এটাকে কি আধুনিক যুগের দাসপ্রথা বলা যায়?' আমার প্রশ্ন শুনে সে বই বন্ধ করে বিছানা থেকে উঠে বসল। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'ডিবেটের টপিক হিসেবে এটা খুব মজার একটা টপিক। এর পক্ষেও যেমন যুক্তি আছে, বিপক্ষেও তেমনি যুক্তি আছে।'

পত্রিকা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'আগে পক্ষের যুক্তি শুনি।'

'তোর মনে আছে কি না জানি না, রোনালদো যখন ম্যানইউ থেকে রিয়ালে যায় তখন এই টপিক নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়। ফুটবলারদের ট্রান্সফার সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে তখনকার ফিফার প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটার বলেন, ফুটবলাররা এখন দাস।[১] এই

---

[১] Dailymail, 11 July 2008

বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ফিফার প্রেসিডেন্টের সাথে সহমত পোষণ করে রোনালদো বলেন, I am a slave—'আমি একজন দাস।'[১]

'ফুটবলারদের যেভাবে কেনাবেচা হয় সেটাকে দাস কেনাবেচার সাথে তুলনা করা যায়। আগেকার দাস মালিকরা দাসদেরকে দিয়ে মাঠে কৃষিকাজ করাত আর এখনকার ফুটবল ক্লাবগুলো প্লেয়ারদেরকে দিয়ে মাঠে ফুটবল খেলায়। দাসদের যেমন লক্ষ্য থাকত মনিবের সন্তুষ্টি, তেমনি প্লেয়ারদেরও লক্ষ্য থাকে ভালো খেলে ক্লাব ম্যানেজারের সন্তুষ্টি অর্জন। এখনকার ফুটবলারদের সাথে আগেকার দাসের বৈশিষ্ট্য তুলনা করলে বলতে পারিস—Yes technically, footballers are the present day's slave!'

আরজুর পক্ষের যুক্তির সাথে কিছুটা দ্বিমত করলাম—'ফুটবলাররা তো স্বেচ্ছায় ক্লাবে খেলে। তারা তো বাধ্য হয়ে ক্লাবে খেলে না। এমনকি রিয়াল-বার্সা-ম্যানইউতে খেলা তো তাদের স্বপ্ন বলা যায়। আর এই খেলার বিনিময়ে তারা পারিশ্রমিকও পায়, আগেকার সময়ে যেটা দাসরা পেত না, তাদের মালিক পেত। তাহলে তাদেরকে 'দাস' বলাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?'

'দেখ আরিফ, আমি তো এটা আগেই বলেছি, It's a matter of debate. তুই চাইলে পক্ষেও যুক্তি দেখাতে পারবি, আবার বিপক্ষেও যুক্তি দেখাতে পারবি। বিষয়টা চিরন্তন সত্য এমন না। আরেকটা বিষয় কি জানিস? এই যে চাকরি করা, এটাকেও আধুনিক যুগের দাসপ্রথা বলা হয়।'

'তুই কি Corporate Slavery'র কথা বলছিস?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এ্যাকজাক্টলি। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী, কেউ যদি কারও বৈধ মালিকানাধীন হন এবং তার অধীনে কাজ করতে বাধ্য হন তাহলে তিনি তার একজন দাস বলে গণ্য হবেন। কেউ যদি খুব কঠোর পরিশ্রম করেও তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক না পায় তাহলে তার এই শ্রমকেও দাসশ্রম বলে গণ্য হবে। এমনকি কেউ যদি কারও ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয় অথবা কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে ও দাস বলে গণ্য হবে।

দাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী, কর্পোরেট জবকেও এ যুগের দাসপ্রথা বলা হয়। কারণ, জবের এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সে একপ্রকার কোম্পানির বৈধ মালিকানাধীন আর সে

[১] The Guardian, 10 July 2008

কোম্পানির কাজ করতে এক রকম বাধ্য। স্যালারীর ব্যাপার নিয়ে তো মালিক-শ্রমিক ঝগড়া লেগেই আছে। তার ওপর বসের সন্তুষ্টির ওপর প্রমোশন-ডিমোশন নির্ভর করছে। এজন্য কেউ কেউ এটাকে Corporate Slavery বলে।'

সকালের নাশতা করতে যাবার সময় সাব্বিরকে বলেছিলাম আমাদের জন্য সিঙ্গারা আনতে। সাব্বির সিঙ্গারা নিয়ে রুমে এলো। গরম গরম সিঙ্গারা, এখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে। টেবিলের ওপর থেকে সস নিয়ে সিঙ্গারায় লাগালাম। আরজুকে সিঙ্গারা দিতে দিতে বললাম, 'কিন্তু জাতিসংঘের The Universal Declaration of Human Rights চার্টারের প্রথম অনুচ্ছেদেই তো বলা আছে, All human beings are born free and equal in dignity and rights. মানুষ জন্মগতভাবে যেখানে স্বাধীন, সেখানে কীভাবে এখনও দাসপ্রথা থাকে?'

আরজু হাসল। 'এটা তো স্রেফ একটা ঘোষণা, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। Global Slavery Index (2016) অনুযায়ী তো এখনও বিশ্বে ৭০ মিলিয়ন, মানে ৭ কোটি দাস আছে। উত্তর কোরিয়ায় সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক চাকরিতে নিয়োজিত শ্রমিক আছে ২.৮ মিলিয়ন।[১] আর চীনে কারাবন্দি দাস, যারা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিচ্ছে তাদের সংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে ২০ কোটি।[২] মজার বিষয় হলো, তুই জাতিসংঘের যে চার্টারের কথা বললি সেটা কিন্তু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র একটা উক্তি। ইন ফ্যাক্ট, তিনি সেটার প্রয়োগও করেছিলেন।'

'রিয়েলি!'

'ইয়েস, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতের সময় মিসরের গভর্নর ছিলেন আমর ইবনুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। একদিন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ছেলে এক কপটিক খ্রিস্টান ছেলের ঘোড়া নিজের বলে দাবি করেন। ছেলেটি ঘোড়া না দেওয়ায় আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ছেলে সেই কপটিক ছেলেটিকে মারধর করেন আর বলেন, 'আমি আমিরের ছেলে'। মার খেয়ে ছেলেটি মিসর থেকে সোজা ছুটে যায় মদিনায়। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে গিয়ে ছেলেটি ন্যায়বিচার চায়। ঘটনা শুনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি লিখে বলেন ছেলেকে নিয়ে মদিনায় আসতে।

---

[১] Washigtonpost, 19 July 2018

[২] Legai, Handbook (2008), page 6

ছেলেকে নিয়ে মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় আসেন। খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসরের ছেলেকে একটা চাবুক দিয়ে বললেন, এবার এই আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ছেলেকে মারো। মিসরের ছেলেটি ইচ্ছামতো চাবুক দিয়ে মিসরের গভর্নরের ছেলেকে মারল। এরপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এবার চাবুক নিয়ে আমাকে মারো। কারণ, আমার ক্ষমতার জন্যই আজকে এই অবস্থা হলো। ছেলেটি বলল, আমি সন্তুষ্ট এবং আমার রাগও কমে গেছে। অতঃপর খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যে প্রশ্নটি করেন, সেটিই এখন জাতিসংঘের চার্টারে আছে- How can you enslave a man who was born free?'[১]

সিঙ্গারা খেতে খেতে এবার সাব্বির বলল, 'কিন্তু আরজু ভাই, ইসলাম ধর্ম তো দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেনি।'

আরজু পাল্টা প্রশ্ন করল, 'দাসপ্রথা কথাটি শোনার সাথে সাথে কী রকম সিনারিও'র কথা তোমার মাথায় আসে?'

'এই যেমন ধরো, আফ্রিকা থেকে ধরে এনে লঙ্গাড় দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। তারপর ইচ্ছেমতো তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো হয়। তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হয়।'

সাব্বিরের কথা শেষে আরজু বলল, 'যেমনটা Uncle Tom's Cabin উপন্যাস পড়ার পর তুমি বলেছিলে (সাইমন লিগ্রি টমের সাথে অমানবিক আচরণ করেছিল) এমনটা?'

'Sort of like this.' সাব্বির বলল।

আরজু এবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আরিফ, Atlantic Slave Trade সম্পর্কে তুই কিছু জানিস?'

'আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে দাস ব্যাবসার কথা বলছিস?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

---

[১] The History of Umar, Ali Tantawi, page 155-156

'হ্যাঁ, এটা জানব না কেন? ১৫০০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা জোর করে আফ্রিকার লোকজনকে দাস বানিয়ে অ্যামেরিকায় নিয়ে যায়। এই সময় ১০-১২ মিলিয়ন, আই মিন এক কোটি থেকে ১.২ কোটি আফ্রিকান আমেরিকায় দাস হিসেবে বিক্রি হয়। যাত্রাপথেই তো তাদের ১৫ % মারা যায়।[১]

সাব্বির পাশ থেকে বলল, 'এটা তো একপ্রকার কিডন্যাপিং। কিডন্যাপ করে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া।'

'ব্রিটিশদের কিডন্যাপিং সিস্টেম তো ছিল আরও নিষ্ঠুর। ১৬৮০-১৭৮৬ এই সময়ের মধ্যে ২১,৩০,০০০ দাস তারা কিডন্যাপ করে।[২] ব্রিটিশরা আফ্রিকার জঙ্গালগুলোতে পশু শিকার করার চেয়েও নিষ্ঠুরভাবে মানুষ শিকার করত। তারা জঙ্গালে আগুন লাগিয়ে দিত। জঙ্গালবাসী আগুন থেকে বাঁচার জন্য যখন কোথাও একত্রিত হতো, সেখান থেকে ব্রিটিশরা তাদেরকে ধরে নিয়ে যেত এবং দাস বানাত।'[৩]

এতোটুকু বলার পর যখন আরজু থামল, তখন আমি আর সাব্বির সমস্বরে বলে উঠলাম, কী নিষ্ঠুর!

আরজু বলে চলল, 'ইউরোপ-আমেরিকার দাসপ্রথা হলো কিডন্যাপ করে নিয়ে দাস বানানো। আর দাসপ্রথা শুনতেই আমাদের মনে আসে ইউরোপ-আমেরিকার দাসপ্রথার ইতিহাস। এই ইতিহাস মাথায় রেখে ইসলামের সমালোচকরা বলে, ইউরোপ-অ্যামেরিকায় দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও ইসলামে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটেনি। অথচ এই ধরনের 'কিডন্যাপিং দাসপ্রথা' ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবেন যার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যে কোনো মুক্ত মানুষকে (দাস হিসেবে) বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল।'[৪]

---

[১] Encyclopedia of Britannica: Atlantic Slave Trade BY Thomas Lewis

[২] islamqa/9480

[৩]Encyclopedia of Britannica 2/779

[৪] সহীহ বুখারী : ২২২৭

আমি বললাম, 'তাহলে তো যেই সেন্সে পাশ্চাত্যে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ সেই সেন্সে ইসলামেও দাসপ্রথা নিষিদ্ধ।'

'হ্যাঁ, দাস বানানোর যে মূল সোর্স (কিডন্যাপিং) সেটি ইসলামেও নিষিদ্ধ। এটা নিয়ে Adam Watson নামের একজন একটা বই লেখেন- Muhammad The Abolitionist: Slavery in Quran. তার বইতে তিনি বলেন, ইসলাম সেই কুপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে, আমেরিকার অবসান ঘটানোর ১৩০০ বছর পূর্বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুজন বিখ্যাত সাহাবীকেও কিন্তু কিডন্যাপ করে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়!'

আমি আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'যায়িদ ইবনু হারিসা আর সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)?'

আরজু বলল, 'হ্যাঁ। জাহেলী যুগে তাদেরকে কিডন্যাপ করে দাস বানানো হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্ত করে দেন এবং সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্ত করে দেবার জন্য তার সাহাবীদেরকে বলেন।'

সাব্বির জিজ্ঞেস করল, 'দাসদের ওপর অত্যাচারের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? এই যেমন, ব্রিটিশ এমপি এবং দাসপ্রথা বিলুপ্তি আন্দোলনের নেতা William Wilberforce এর ভাষণগুলোতে দেখতে পাই ইউরোপে দাসদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের কথা, তাছাড়া আরবেও তো দাসদের ওপর অত্যাচার করা হতো। দাস থাকাবস্থায় বিলাল আর খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র ওপর নির্যাতনের কাহিনী তো অনেক হার্ট-টাচিং।'

'ইউরোপে দাসদেরকে মেরে ফেললেও তো কোনো বিচার ছিল না। তাদেরকে চাবুক দিয়ে পিটানো, লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, হাত-পা কেটে ফেলা এগুলো তো ছিল তাদের কাছে খুব সাধারণ ঘটনা। এমনকি বাইবেলেও বলা আছে, মালিকের রডের আঘাতে যদি দাস মারা যায় তবেই মালিককে শাস্তি দেওয়া হবে। আর আঘাতের ফলে যদি দাস মারা না যায়, দুই-তিন দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায় তবে মালিককে শাস্তি দেওয়া হবে না। কারণ, দাস তো মালিকের সম্পত্তি[১]।

[১] Bible (Old Testament) Exodus 21:20-21

আর ইসলাম কী বলছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে কেউ একজন তার দাসিকে বিচার্য অপরাধ ছাড়া থাপ্পড় মারলে তিনি এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই দাসিকে মুক্ত করে দিতে বলেছেন।[১]

মেরে ফেলা তো অনেক পরের বিষয়, রড দিয়ে আঘাত করা তো বাদই দিলাম, স্রেফ থাপ্পড় মারার দরুন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসকে মুক্ত করে দিতে বলেছেন।'

আরজুর কথা শেষ হলে আমিও তার সাথে যোগ করলাম, 'আর ইসলাম তো দাসমুক্ত করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ দাসমুক্তিকে 'সৎকর্ম' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ধনী সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তো একাই ৩০,০০০ দাস মুক্ত করেছেন।'

'শুধু কি দাসমুক্তি? ইসলাম মুক্ত দাসের সাথে এমন আচরণ করেছে যেটা দেখে তখনকার কাফিরদের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দেন কা'বা ঘরে উঠে আযান দিতে। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'বা ঘরে উঠে যখন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' বলে আযান দিতে থাকেন তা দেখে মক্কার কাফিররা অবাক হলো। যে-লোকটিকে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হিসেবে মক্কাবাসী বিবেচনা করত, যে-লোকটির জীবনের কোনো মূল্য তাদের কাছে ছিল না, সেই লোকটি কি না তাদের পবিত্র উপাসনালয়ের ওপর আরোহণ করে আযান দিচ্ছে?

খালিদ ইবনু উসাইদ তখন বলল, ভাগ্যিস এই দৃশ্য দেখার আগে আমার বাবা মারা গেছেন! হারিস ইবনু হিশাম বলল, 'হায় হায়! আমি যদি বিলালকে কা'বা ঘরের ওপর দেখার আগেই মারা যেতাম!'

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর আগে পরবর্তী খলিফার প্রসঙ্গ উঠলে যে কয়জনের কথা বলেন তার মধ্যে সালিম রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন। তিনি বলেন, 'আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আযাদকৃত দাস সালিম রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি

---

[১] সহীহ মুসলিম : ১৬৫৭

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭৭

বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি পরামর্শ করা ছাড়াই তাকে খলিফা নিযুক্ত করতাম।' চিন্তা করো, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হতে পারতেন একজন আযাদকৃত দাস!'

আরজুর কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করলাম, 'সালিম রাযিয়াল্লাহু আনহু কি সেই চারজনের একজন, যাদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন শিখতে বলেছেন?'[১]

আরজু মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। আর তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মসজিদ, মসজিদুল কুবা'র ইমাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আযাদকৃত দাস যায়িদ ইবনু হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে উসামা ইবনু যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সবচেয়ে কমবয়সী 'জেনারেল' হিসেবে অভিযানে পাঠান।

ইউরোপের দাসরা কোনো রঙ্গিন কাপড় পরতে পারত না, এমনকি জুতোও পরতে পারত না। দাসদের জন্য আলাদা পোশাক ছিল। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আবু যর আল গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার তার দাসের সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তার পরনে যেরকম চাদর ছিল, তার দাসের পরনেও সেরকম চাদর ছিল। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আপনার দাসের গায়ের চাদর নিয়ে নিতেন, এতে আপনার একজোড়া চাদর হয়ে যেত। আর তাকে অন্য কাপড় দিয়ে দিতেন। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তারা (দাসেরা) তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরাবে আর তাদের ওপর ভারী কোনো কাজ চাপাবে না। যদি চাপাও তাহলে তুমি নিজেও যেন তাকে সাহায্য করো।'[২]

আরজুর ফোন এলো। তাকে বাইরে যেতে হবে। যাবার আগে বলল, 'জানিস? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের পর তাকে সর্বপ্রথম যিনি স্পর্শ করেন তিনি ছিলেন একজন দাসি।'

'কী নাম তার?'

---

[১] সহীহ বুখারী : ৩৮০৬

[২] সহীহ বুখারী : ৬০৫০

'উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহা।'

'আজকের রাতের আড্ডার টপিক তাহলে 'দাসপ্রথা' থাকুক?' আমি প্রস্তাব করলাম।

'হ্যাঁ, ফিরে আসি, ইন শা আল্লাহ'।

সমকালীন প্রকাশন-এর বইসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক/সম্পাদক	ধরণ
০১	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা এবং নাইলাহ আমাতুল্লাহ	মৌলিক
০২	পড়ো	ওমর আল জাবির	মৌলিক
০৩	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	মৌলিক
০৪	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	সংকলন
০৫	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	মৌলিক
০৬	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	অনুবাদ
০৭	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	সংকলন
০৮	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ (দুই)	আরিফ আজাদ	মৌলিক
০৯	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	অনুবাদ
১০	বাক্সের বাইরে	শরীফ আবু হায়াত অপু	মৌলিক
১১	জীবন পথে সফল হতে	শাইখ আব্দুল কারিম বাক্কার	অনুবাদ
১২	যে জীবন মরীচিকা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	অনুবাদ
১৩	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	অনুবাদ
১৪	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	মৌলিক
১৫	সেইসব দিনরাত্রি	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	অনুবাদ
১৬	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	সংকলন
১৭	শিশুর মননে ঈমান	ড. আইশা হামদান	অনুবাদ
১৮	মেঘ কেটে যায়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	অনুবাদ
১৯	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	সংকলন
২০	সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	মৌলিক
২১	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়্যুম আস-সুহাইবানী	অনুবাদ
২২	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	অনুবাদ
২৩	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	অনুবাদ

আরিফুল ইসলাম। পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আত্মচেতনাই তাকে উজ্জীবিত করেছে দৃপ্ত-হাতে সত্যের কলম তুলে নিতে।

তিনি একজন অনলাইন এক্টিভিস্ট, ভালোবাসেন সত্য উন্মোচন করতে এবং উন্মোচিত সত্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে।

সমকালীন প্রকাশন

আমাদের সবুজ উপত্যকায় মাঝে মাঝে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে নেমে আসে সর্বগ্রাসী এক অদ্ভুত অন্ধকার। সেই অন্ধকার ঝেঁকে বসে আমাদের নীলাভ আকাশে। হৃদয়-প্রকৃতিজুড়ে শুরু হয় এক মহা দুর্যোগ। মায়ের গর্ভ হতে বিশ্বাসের যে অঙ্কুর আমরা বুকে ধারণ করে বেড়ে উঠি, দুর্যোগের ঘনঘটায় সেই অঙ্কুর টালমাটাল হয়ে ওঠে।

এরপর, মাঝে মাঝে কেউ আলো হাতে আবির্ভূত হয়। ডুবে যাওয়া নগরীতে এক টুকরো আলো এসে পড়ে। সেই আলোয় বিলীন হতে থাকে অন্ধকার। বিশ্বাসের যে আদিম চারাগাছকে তারা উপড়ে দিতে চেয়েছিল, সেই চারাগাছ ধীরে ধীরে বটবৃক্ষ হয়ে তাদের মাথার ওপর বিরাজমান হয়।

সেই অন্ধকার কাটাতে এই তল্লাটে যে ক'টি চরিত্র বুক পেতে দাঁড়িয়েছে, আরজু তাদের একজন। তার যুক্তি, তর্ক আর তথ্যের বাহারে সে বের করে আনে ধ্রুব সত্যকে। এভাবেই আরজু ছুটে চলে তার গন্তব্যে। কোথায় গিয়ে থামবে সে?

ISBN
9 789849 386414